Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

প্রত্যেক যুগের চালু ধারণাগুলি সব সময়েই শাসকশ্রেণীর ধারণার প্রতিফলন। এভাবেই অর্থনীতিবিদ এবং তাঁর অর্থনীতি শাস্ত্র ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের আজ্ঞাবাহী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন।
—কার্ল মার্কস্

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

করোনা অতিমারী ভয়াবহ ১
দেশে-বিদেশে ২
২১শে'র নির্বাচন—কিছু ভাবনা ৩
উন্নয়নের নামে প্রবঞ্চনা ৪
বাজার অর্থনীতির টোটকা অচল ৫
রানাঘাটে কোভিড মোকাবিলায় আর এস পি ৬
বিপর্যয় ও বামপন্থার সংকট ৭
মোর্চার পক্ষে সন্ত্রাস বন্ধের দাবি ৮

68th Year 35th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 1st May. '21, 8th May. 2021 Joint Issue

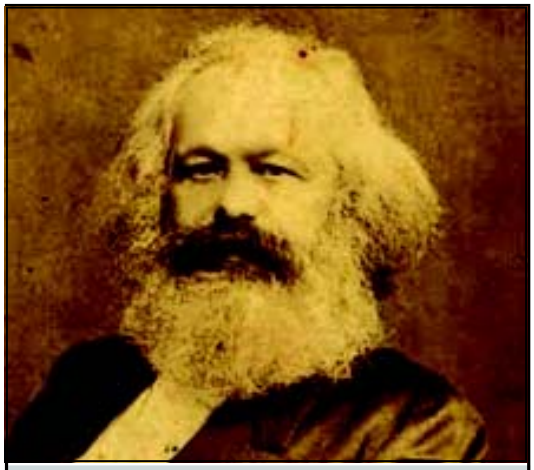

কার্ল হাইনরিখ মার্কস

(জন্ম : ৫ মে ১৮১৮, প্রয়াণ : ১৪ মার্চ ১৮৮৩)

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। তাঁর মতো এক দার্শনিক চিন্তাবিদ ও সর্বোপরি বিপ্লবীর জীবন নিপীড়িত মানব সমাজের মুক্তির পথ নির্দেশক হিসেবে কার্ল মার্কস চিরস্মরণীয়। তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্-এর ভাষায় মার্কস ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। যাঁর সমস্ত চিন্তাই একান্তভাবে নিবদ্ধ ছিল বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বা শ্রমজীবী মানুষদের সুস্থ সুন্দর জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা তৎকালীন রাষ্ট্রীয় স্থিতাবস্থাগুলির কাছের মৃত্যু শেল বলে প্রতীত হচ্ছিল।

কার্ল মার্কস ছিলেন এক অনন্য দার্শনিক। দর্শনশাস্ত্র তাঁর অধীত বিদ্যাও বটে। ফলে তাঁর দার্শনিক হয়ে ওঠা হয়তো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু মানব সমাজের ক্রমিক পরিবর্তন, অর্থনীতির দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃতি এমনকি পৃথিবীর প্রায় অগম্য স্থান সাইবেরিয়া অঞ্চলের আদিম জাতিদের জীবনচর্যা নিয়ে সুগভীর অনুসন্ধান তাঁর অবিশ্বাস্য কর্মকৃতি। তাঁর সমগ্র জীবনের ভাবনা এবং দিকনির্দেশ তাঁর মহাপ্রয়াণের এত দীর্ঘকাল পরেও আমাদের মননকে ঋদ্ধ করে, সচেতন করে এবং সজাগ করে। তিনি এই প্রবল মনুষ্যজীবন নিধনকারী অতিমারীকালেও অতীব প্রাসঙ্গিক এবং সতত স্মরণযোগ্য। তাঁর অমলিন স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এবং তাঁর নির্দেশিত পথে সচেতন পদক্ষেপের শপথ গ্রহণ করি। কাল মার্কস তাঁর কর্মকৃতিতেই অমরত্ব লাভ করেছেন।

৫ মে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং কলকাতা শহর ও শহরতলীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলে আর এস পি কর্মীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে কার্ল মার্কসকে স্মরণ করেছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য বামফ্রন্টের উদ্যোগে ৫ মে সকাল সাড়ে দশটায় কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে মার্কস-এঙ্গেলস-এর মূর্তির সামনে নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কম বিমান বসু, সি পি আই (এম)-এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, সি পি আই-এর রাজ্য পরিষদের নেতা কম. প্রবীর দেব, ফরওয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির সম্পাদক কম. নরেন চ্যাটার্জী, আর সি পি আই নেতা কম. মিহির বাইচ, বলশেভিক পার্টির নেতা কম. প্রবীর ঘোষ, ওয়ার্কার্স পার্টির কম. শিবনাথ সিন্‌হা, মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের কম. জয়হিন্দ সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আর এস পি'র পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ, কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জী, আর ওয়াই এফ সম্পাদক কম. রাজীব ব্যানার্জী, কম. মীর জুলফিকর আলি, কম. আদিত্য জোতদার এবং আরও অনেকে।

করোনা অতিমারী ভয়াবহ

মোদীর কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মানুষকে বাঁচাতে ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসও ভয়াবহ

এক চরম যন্ত্রণাদগ্ধ সময় সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকেও গ্রাস করেছে। দেশজুড়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণের করাল ছায়া। মোদী সরকার করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলাতে নিজেদের অকর্মণ্যতা আর গোপন করতে পারছে না। আবারও মনে হচ্ছে যে, নরেন্দ্র মোদীর মতো এমন অপদার্থ স্বৈরাচারী ব্যক্তি আর কখনোই ভারত শাসনের দায়িত্ব বহন করে নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত। দলে দলে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। তাঁরা ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগও পাচ্ছেন না। আর পশ্চিমবঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ভোট পরবর্তী হিংসার বলি হচ্ছে সাধারণ জনজীবন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সপ্তদশ নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে অবাধ সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটে চলেছে। কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব লাগামছাড়া। বেলেঘাটা ও বাইপাস সংলগ্ন বহু অঞ্চলে সাধারণ জনজীবন নিদারুণভাবে আক্রান্ত। বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে নির্বিচারে। লুণ্ঠন চলছে বিনা বাধায়। মহিলাদের সঙ্গে অভব্য অশালীন আচরণে মত্ত মার্কামারা সমাজবিরোধী ও নানাগোত্রের তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। গ্রামগুলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমানের জামালপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ক্যানিং সহ নানা অংশে দিবারাত্রি হামলা চলছে। কম. সুভাষ নস্করের গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত আক্রান্ত।

বীরভূম জেলার নানুর, ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে হিংস্র আক্রমণ শাণিত হচ্ছে। বহুসংখ্যক আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন। অধিকাংশই দরিদ্র মানুষ। ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ নিহত হয়েছেন। যাঁরা এমন জ্ঞানশূন্য হামলায় মারা গেছেন তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে লাভ নেই। আমাদের যা চরম ক্লান্ত করছে তা হ'ল, মানুষ এবং দরিদ্র মানুষ নিহত হচ্ছেন। গরীব মানুষদের সামান্য সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে। মানবতার বিরুদ্ধে এক চরম লজ্জাজনক কর্মসূচি নিয়েছে শাসকদল।

এমন এক চরম সন্ত্রস্ত সময়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক অপশক্তি বিজেপি এবং তাদের মূল সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীদের আক্রমণকে সাম্প্রদায়িক রং দিতে উৎসুক। ফেক ভিডিও ছড়াচ্ছে বিজেপি'র আইটি সেল। বহুক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়, পুরোনো এমনকি, বাংলাদেশের কোনও ঘটনার ভিডিও সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে উস্কানিমূলক বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। এক স্থায়ী বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সমস্ত ধরনের অপচেষ্টা চালাচ্ছে সংঘ পরিবার। তৃণমূল সুপ্রিমো হয় এ প্রসঙ্গে উদাসীন অথবা ধরে নেওয়া যায় তাঁর প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই অভ্যস্ত। বামপন্থীদের বিশেষ আশঙ্কা যে, এমন চলতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এই রাজ্যে দীর্ঘ বহুকাল অন্যান্য ধরনের সংঘাত ঘটলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। বিজেপি'র লক্ষ্য আরও নিবিড়ভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ করে স্থায়ী সামাজিক ক্ষত নির্মাণ। সেই অভীষ্ট পূরণ হলেই বিজেপি'র রাজনীতি ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠবে।

২০১১ র নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করার পর থেকেই শহরাঞ্চলে শুধু নয় বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলেও চরম হিংসার উদ্ভব ঘটেছিল। বহুসংখ্যক বামপন্থী নেতা কর্মীর প্রাণহানি এবং বামদলগুলির অফিসগুলি গায়ের জোরে দখল করা হয়। বামপন্থী কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে অনেককে বছরের পর বছর কারারুদ্ধ করা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার গরীব মানুষকে তাঁদের ভিটেমাটি থেকে নির্মম ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ নিজেদের জমি হারিয়েছেন। ভূমি সংস্কারের সুফল সম্পূর্ণতই অনেক স্থানে হারিয়ে গেছে। দীর্ঘ এক দশককাল এমন ভয়ানক অবস্থা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। কোন কোন স্থানে যদি বা আন্দোলনের চাপে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল, আবার নতুন করে ক্ষত তৈরি করার অপচেষ্টা করে চালাচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট ভূমিকা না থাকলে এবং পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নির্দেশ না দিলে এমন জটিল পরিস্থিতি আরও ভয়ানক রূপ নেবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপর্যুপরি তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন। ভোট সংগ্রহের বিচারে তিনি নিশ্চিতই এখন এই রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য না করেও

এরপর ৬-এর পাতায়

দেশে বিদেশে

মাওবাদীদের-মতদর্শগত চ্যালেঞ্জের মুখে

মাওবাদীদের বিরুদ্ধে বিগত এক দশকেরও বেশি সময় কংগ্রেস বা বিজেপির নেতৃত্বে ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সশস্ত্র অভিযানের মতাদর্শগত ভিত্তিতে স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিগত দশকের এক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওবাদীদের উদ্দেশ্যে হিংসা পরিত্যাগ করে স্থিতিশীল শান্তি স্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন। মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে মাওবাদীদের বাগে আনার চেষ্টাও সফল হয়নি। আর এক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বাস করতেন মাওবাদীদের রাষ্ট্রবিরোধী লড়াই পর্যুদস্ত হচ্ছে এবং তাঁরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হবেই। মাওবাদী বিপদ থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও বেশি আগ্রাসী মনোভাব প্রয়োজন ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও হিংসা বন্ধ হয়নি, মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন সরকারকে দৃঢ়তা সহকারে মাওবাদীদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। সমস্যার এক যুক্তিসংগত বাঞ্ছিত পরিণতি প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের বিদ্যাচরণ শুক্লা সহ মহেন্দ্র শর্মা, নন্দকুমার প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসের ২৫ জন বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ ২০১১ সালের মে মাসে ছত্তিশগড়ের মাওবাদীদের সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালের এই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের পর কেন্দ্রীয় প্রশাসনকেই পিছু হঠতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় নি এবং এই ঘটনা আজ বিস্মৃত। চার বছর পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে হয়। মাওবাদীদের আক্রমণে সুকমা জেলায় ২৫ জন সি আর পি এফ-এর জওয়ান নিহত হয়। নিহত জওয়ানদের 'শহিদের'র মর্যাদা দিয়ে শোকপ্রকাশ, মাল্যদান ইত্যাদি সবই হল, তারপর এই ঘটনাও ইতিহাস হয়ে গেল। কিছুদিন আগে মার্চ মাসে সুকমা জেলাতেই এলমাগুন্ডার জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ছত্তিশগড় পুলিশের ১৭ জন নিহত হয়। একইভাবে অল্প কয়েকদিন আগেই ফের সি এ পি এফ এবং রাজ্য পুলিশের ২২ জন জওয়ান নিহত হয়। এছাড়া নিয়মিত ছোটো খাটো সংঘর্ষ ও হত্যার ঘটনা অব্যাহত। সমস্যা হল, এত অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করছে হয়ত মাওবাদীরা নয়, বরং সরকারই মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং পর্যুদস্ত।

আসলে পুঁজির নির্দেশে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার নেতৃত্বের উপলব্ধির ঘাটতি হল, মাওবাদীদের সঙ্গে অন্যান্য জঙ্গিদের গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন না বা বুঝতে চাইছেন না। মাওবাদীদের ক্ষমতার উৎস তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন (Political Doctrim)। মাওবাদীরা ধ্রুপদী মাওবাদের আদর্শে দীক্ষিত। মাও জে দং-এর ১৯৩৭ সালে রচিত "On Guerrila Warfare' একমাত্র উল্লেখ্য। শুধুমাত্র সামরিক উদ্দেশ্যেই নয়, গেরিলা যুদ্ধের রাজনৈতিক অভিমুখও আছে। ক্রমশ মুক্তাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় সরকার গঠন মাওবাদীদের প্রাথমিক লক্ষ্য, যে সরকার দেশের অন্যত্র এক 'মডেল' সরকার হিসাবে জনগণের মান্যতা পাবে। এমনটাই মনে করেন মাওবাদী যোদ্ধারা। প্রশ্ন হচ্ছে মাওবাদীদের এই মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় করপোরেট পুঁজিবান্ধব সরকারের কতটা সাফল্য অর্জন সম্ভব?

সরকারের শক্তি বা অস্ত্রের জোর থাকলেও সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী কেন বারবার মাওবাদীদের মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে ভেবে দেখা প্রয়োজন। জনগণ, জনমুক্তি ফৌজ এবং অধিকৃত অঞ্চল এই তিনটি ক্ষেত্র মাওবাদী রণনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দণ্ডকারণ্যের মতো বিশাল অঞ্চলে মাওবাদীরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। শত চেষ্টাতেও এদের দমন করা সম্ভব হয়নি। মাওবাদীদের বিশ্বাস জনগণই তাঁদের ক্ষমতার উৎস। এদের সাময়িকভাবে দমন করা গেলেও নির্মূল করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি ধৃত সি আর পি এফ জওয়ান রাকেশ্বর সিংকে মুক্ত করার সময় মাওবাদীদের সমর্থনে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি থেকে মাওবাদীদের গণভিত্তির কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী, সেনাবাহিনী ছাড়া সরকার অবশ্য গান্ধীবাদী আদর্শ এবং আর এস এস-এর ক্যাডারদের মাওবাদী মোকাবিলায় মাঠে নামানোর পরিকল্পনা করছে, এমন খবর শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এবং খেলাটা এবার ভালই জমবে।

অসমে বিজেপি সরকারের দুই সন্তান নীতি

এ বছর গোড়ার দিকে অসমে দুই সন্তান নীতি চালু হয়েছে। আপাতত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক বা একাধিক বিবাহ সূত্রে দুইয়ের বেশি সন্তান হওয়া চলবে না। দুইয়ের বেশি সন্তান থাকলে কোনও আবেদনকারীর সরকারি চাকরির আবেদন গ্রাহ্য হবে না, সরকারের বক্তব্য—রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির রাশ টেনে ধরতে, শিশু বিবাহ রুখতে ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই এই নীতি প্রণোদিত। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, অসম সহ ভারতে নারীদের জনপ্রতি সন্তান সংখ্যা দ্রুত কমছে। এখন অসমে নারী পিছু (অর্থাৎ দম্পতি পিছু) সন্তান সংখ্যা কমে হয়েছে ২.৩ (বিহারে বা উত্তরপ্রদেশে ৩ এর আশেপাশে)। কাম্য লক্ষ্য হল, নারী পিছু ২.১টি সন্তান। অতএব অসমে নারী পিছু সন্তান সংখ্যা কমানো জরুরি প্রয়োজন। এমনটি বলা চলে না।

দ্বিতীয়ত, অসমে মোট বর্তমান জনসংখ্যা ৩ কোটি ১২ লক্ষের মধ্যে। সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা বড় জোড় ৫.৬ লক্ষ। তাহলে ৫-৬ লক্ষ কর্মচারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় আনলেই রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে কী? বিষয়টি কারও কাছেই স্পষ্ট নয়।

তাছাড়া, সরকারি কর্মচারীরা শিশু বিবাহ করতে পারবেন না বলে যে নীতির কথা বলা হয়েছে তাও যথেষ্ট গোলমেলে। এমন সম্ভাবনা প্রায় নেই যে এক মাঝারি বা উচ্চশিক্ষিত সরকারি কর্মচারী নিশ্চয় চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে করবে।

দুই সন্তান নীতির ক্ষেত্রেও বেশ অস্বচ্ছতা আছে। বেশি সন্তান আজকাল সরকারি চাকুরিজীবিদের হয় না। হয় ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঠেকাতে রাজ্যের সেই অসংখ্য মানুষদের জীবনযাপনের মান উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত না করে মাত্র ৫-৬ লক্ষ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু করার পেছনে আসল মতলব কী!

দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে নাজেহাল সরকার জানেন, অযোধ্যার রামমন্দির আর জয় শ্রীরাম স্লোগানে কাজের কাজ হবে না। ভোট বৈতরণী পার হওয়া মুস্কিল। মানুষের নজর ঘোরাতে নানা ফন্দিফিকিরের প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বাংলাদেশী মুসলমানে রাজ্য ভরে গেছে। অসমে নাকি নানাভাবে মোগল আক্রমণ অব্যাহত। শেষে সরকারি কর্মচারীদের উপর এই নতুন ফরমান। হিন্দু কর্মচারীদের বোঝানো হবে, আরে এই সব নিয়মনীতি মুসলমানদের জন্য আনা হচ্ছে, হিন্দুদের কোণঠাসা করতে "তিন বিবি চল্লিশ বাচ্চা" পলিসি নিয়ে এরা বাচ্চা জেহাদ করে। হিন্দু কর্মচারীও মুসলমানদের বাচ্চা জেহাদ রুখতে এই নীতির বিরুদ্ধে চুপচাপ থাকবে। উপরন্তু অসম রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই নীতি চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রসঙ্গত দিল্লী হাইকোর্টেও বিজেপির পক্ষ থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়ার আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

গত কয়েক বছরে ভারতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কোনো নিয়মকানুন লাগু না করেই হচ্ছে। বর্তমান জন্মহার নিম্নমুখী, পরিবার নিয়ন্ত্রণের উপর দখল দিলে তার কুপ্রভাব সার্বিকভাবেই পড়তে পারে, যা শাসক শ্রেণি কাম্য নয়। ৮০-র দশকের অভিজ্ঞতা মনে আছে তো! মনে হয় ক্ষমতাসীনদের এই ভেদনীতি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণে ফলপ্রসূ হবে না।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার শংসা পত্র

"আমাদের গর্ব হওয়া উচিত যে প্রধানমন্ত্রী নিজে অক্সিজেন জোগান বাড়ানোর বিষয়টি দেখছেন"— সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এমন শংসা পত্র দিয়েছেন। আমরা দেশবাসীরাও একই সঙ্গে গর্বিত যে, প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ পরিচালনায় করোনা অতিমারি মোকাবিলায় গোটা দেশ এখন এক অভূতপূর্ব জাতীয় সঙ্কটে নিমজ্জিত।

দেশের বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিকে 'জাতীয় সঙ্কট' এর আখ্যা দিয়ে ভারতের শীর্ষ আদালত বলছে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারে না। মানুষের জীবন বাঁচানোর অগ্রাধিকার দিয়ে— আদালত প্রয়োজন হলে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। জাতীয় সঙ্কটের মোকাবিলায় কেন্দ্রের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা জানতে চেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা। সুপ্রিম কার্ট জানতে চেয়েছে যে ভাবে সংক্রমণ বাড়ছে তাতে অক্সিজেন, রেমডেসিভিয়ার এবং প্রতিষেধকের বিপুল চাহিদা পূরণ কী ভাবে করা হবে। জোগানের সমস্যা পূরণে মোদী সরকারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছে। দেশে করোনা প্রতিষেধকের দামের তারতম্যের সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছে কেন এমন অনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর সরকারি অনুমোদনের ছাপ পড়ল। জনগণের অভিযোগ প্রতিষেধকের দামের এই তারতম্যের পেছনে কোন কুচক্র কাজ করছে তা, প্রকাশ করতে হবে। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য দায়ী দুষ্কৃতীদের আদালতে অভিযুক্ত করতে হবে। জনগণের দাবি—এক দেশে প্রতিষেধকের এক দামই রাখতে হবে। এক এক প্রস্তুতকারী সংস্থার এক এক রকমের দামের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যার দাবি জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তাছাড়া এই সংকটকালীন মুহূর্তে প্রতিষধকের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেটেন্ট আইন প্রয়োগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের সকলকে ১ মে থেকে প্রতিষেধক নিশ্চিত করার ঘোষণাকে 'খুড়োর কল' বলেই অনেকে মনে করছেন যা, চাহিদা জোগানের বিচারে কার্যত অসম্ভব। প্রসঙ্গত প্রতিষেধকের দাম নিয়ে যে যাচ্ছেতাই কাণ্ড চলছে তাকে এক কথায় 'Vaccine Darwinism' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ, যার পয়সা আছে তারই ভ্যাকসিন পাওয়ার অধিকার থাকবে, যার নেই তার ভাগ্যে লবডঙ্কা!

দৃষ্টান্তমূলক দ্রুততার সঙ্গে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকারী ডেরেক শ্যভিনকে দোষী সাব্যস্ত করল আমেরিকার আদালত

জর্জ ফ্লয়েডের বীভৎস হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার ডেরেক শ্যভিনকে অপরাধের এক বৎসর পূর্ণ হবার আগেই বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে আমেরিকার আদালত দোষী সাব্যস্ত করল। এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায় শিহরিত হয়েছিল সারা দুনিয়া এবং আমেরিকা জুড়ে শুরু হয়েছিল "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার" আন্দোলন, আন্দোলনের সমান্তরালে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে আমেরিকান আদালত দেরী করে নি। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এই রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস 'জর্জ ফ্লয়েড বিল' পাশের মাধ্যমে পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলেছেন।

আমাদের দেশ ভারতের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এদেশে নাগরিক হত্যায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাও কার্যত অসম্ভব। দোষী সাব্যস্ত করা তো অনেক পরের কথা। আইনের শাসনের কাছে আইনরক্ষকের সমান দায়বদ্ধতার কথাই ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডে তুলে ধরা হয়েছে বলে এই রায় ঐতিহাসিক এবং যে দৃষ্টান্তমূলক দ্রুততার সঙ্গে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তা আরও সাধুবাদযোগ্য— Justice delayed is justice denied এই আপ্তবাক্যটি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

আমেরিকার আদালতের এই কৃতিত্ব ভারতের কাছে অবশ্য শিক্ষণীয়। ভারত এমন এক দেশ যেখানে 'এনকাউন্টার' প্রায় আইনি স্বীকৃতি পেতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া তো দূরের কথা, জনমানসে সামান্য হেলদোলও নজরে আসে না। তাছাড়া এদেশে পুলিশি হেফাজতে অগণিত মৃত্যুর ঘটনাও জাতি ধর্ম বর্ণবিদ্বেষ দ্বারা বিচারপতিদেরও প্রভাবিত করে যা সুবিদিত ঘটনা। পুলিস বা প্রভাবশালীদের নানা দুষ্কৃতি অনেক ক্ষেত্রেই আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় না বা পৌঁছালেও অতি বিলম্বে বিচার প্রক্রিয়ায় কাজের কাজ কিছুই হয় না।

ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ড মামলার দৃষ্টান্ত থেকে দেশের বিচার ব্যবস্থা শিক্ষা নিলে এদেশে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য কিছুটা উদ্ধার হতে পারত।

২১শে'র নির্বাচন—কিছু ভাবনা

মনোজ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ একমাস দু'দিন সময়ব্যাপী সংঘটিত বিধানসভার ভোট পর্ব ২৯ এপ্রিল সমাপ্ত হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল সদ্য ঘোষিত। এখনও সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল জানা সম্ভব হয়নি। দু'টি কেন্দ্র, জঙ্গিপুর এবং সামশেরগঞ্জে ভোটগ্রহণ স্থগিত রয়েছে। দুই কেন্দ্রের প্রার্থী কোভিড-১৯ সংক্রমণে প্রয়াত। খড়দহ কেন্দ্রেও জয়ী প্রার্থীর একই কারণে মৃত্যুর ফলে মোট তিনটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। ১৬ মে দিন স্থির হয়েছিল। আপাতত তা-ও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত।

করোনা অতিমারি এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে চরম আতঙ্কের পরিবেশ নির্মাণ করেছে। সাধারণ মানুষ এক গভীর আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছেন। বস্তুত প্রতিদিন এমন আতঙ্ক আরও ব্যাপক আকারে মানুষের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তার উদ্রেক করেছে। হাসপাতালগুলিতে কোনও শয্যা নেই। চিকিৎসা পরিকাঠামো বাস্তবে বিপর্যস্ত। সামান্য অক্সিজেনের জন্য হাহাকার।

অসুস্থ মানুষদের ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবাও দেওয়া যাচ্ছে না। বহু মানুষের অসহায় মৃত্যুর পরেও মৃতদেহগুলির সুষ্ঠু সৎকার সম্ভব হচ্ছে না। শ্মশানগুলিতে এবং হাসপাতাল মর্গে মৃতদেহের পাহাড় জমে উঠছে। সামান্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও অমিল। অসুস্থ মানুষ অসহায়ের মতো বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। সারা দেশ জুড়ে এমন এক চরম আতঙ্কজনক অতিমারির পরিবেশে কেন্দ্রীয় সরকার দিশাহীন এবং আর্ত মানুষের পাশে নেই। খোদ রাজধানী শহর দিল্লিতে মানুষ মারা পড়ছেন বিনা চিকিৎসায়।

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত রাজ্য পুডুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন সমাধা হয়েছে। কেরল রাজ্যে দীর্ঘ চারদশকেরও বেশি সময় বাদে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট পরপর দু'বার সরকার গঠন করতে সমর্থ হল। পিনারায়ি বিজয়নের নেতৃত্বে এল ডি এফ বেশ ভালভাবেই বিজয় হাসিল করেছে। তামিলনাড়ু রাজ্যে ডি এম কে (দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম) নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মোর্চা ওই রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বিপুল ভোটে পরাস্ত করে প্রয়াত করুণানিধির পুত্র স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সরকার গড়ার পথে। তামিলনাড়ুর নির্বাচনী জোটে জাতীয় কংগ্রেস, সি পি আই (এম), সি পি আই প্রভৃতি অনেক কটি দল সামিল ছিল। আসন রফার ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের দৃঢ়তার জন্যই দুর্বল কংগ্রেস অনেক বেশি আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি।

কেন্দ্রশাসিত ক্ষুদ্র রাজ্য পুডুচেরিতে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অসমে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও অবশেষে অনেকের আগাম পর্যবেক্ষণ ভুল প্রমাণিত করে সেই বিজেপিই এবারেও জয়ী। এন আর সি, সি এ এ প্রভৃতি নিয়ে অসমের জনসমাজে যে সন্ত্রস্ত মনোভাব নানাভাবে প্রকট হয়েছিল সেসব ভোটের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়নি। পুনর্বার সর্বানন্দ সোনোয়াল-হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে বিজেপি সরকারই গঠিত হচ্ছে। জয়ের ব্যবধান অবশ্যই কমেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফল:

রাজ্য বিধানসভায় বিপুল জয় পেল মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেস। পরপর তৃতীয় বারের জন্য মমতা ব্যানার্জী সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন। সম্ভবত একারণেই যে এবারের ভোটে তিনি নিজে পরাস্ত হয়েছেন। যে পরিস্থিতিতে ভোট প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে তাতে বলা চলে এই জয় চমকপ্রদ। বিজেপি'র পরাভব ঘটেছে চূড়ান্তভাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি জয় প্রকাশ নাড্ডা থেকে শুরু করে প্রায় সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে সর্বশক্তি নিয়ে বস্তুত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মোদী এবং শাহ দৈনন্দিন ভিত্তিতে অসংখ্য জনসভা, রোড শো ইত্যাদিতে মেতে উঠেছিলেন। নির্বিচারে কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়েছেন। মোদী স্বয়ং এই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত মনে করে মাত্রাহীন প্রগলভতার বিস্তার ঘটিয়েছেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁর বঙ্গ বিজয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

অমিত শাহ নানা জনসমাবেশে দাবি করতে শুরু করেছিলেন যে, বিজেপি দু'শর বেশি আসন জিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেই। স্বয়ং শাহ যখন বলছেন তখন, রাজ্যের নেতারা বিশেষ করে, দলের রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ, সায়ন্তন বসু প্রমুখ প্রকাশ্য সভায় বিরোধীদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে বলে অতি উদ্ধত ভঙ্গিতে ধমক দেওয়াও শুরু করেন। অন্যান্য ছোট বড় মেজ নেতারাও একই পথে চলতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। শালীনতার ন্যূনতম সীমা পর্যন্ত অবলীলায় লঙ্ঘন করে চলেন এইসব নেতারা।

বিজেপি'র এমন দানবীয় আগ্রাসন পশ্চিমবঙ্গের বহুসংখ্যক মানুষকে তটস্থ করে তুলেছিল। বামপন্থীদের প্রচারে ধারাবাহিকভাবে বিজেপি'র উগ্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চারে বলা হয়েছে। এই রাজ্যের সংস্কৃতি কৃষ্টি চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় মোদী-শাহ'র অতীব নোংরা বহুবিধ কু-উচ্চারণে। বাংলার মানুষকে যে প্রাদেশিক ভাবনার দিক থেকে চরম বিড়ম্বনায় ফেলছে বিজেপি'র বর্বরসুলভ নির্বাচনী প্রচার, তার নিহিত অর্থ বামপন্থী দলগুলি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বিপরীত দিকে তৃণমূল নেত্রী এমন অবস্থার সুযোগে বাঙ্গালী শ্যাভিনিজমকে উস্কে দিয়ে তাঁর নির্বাচনী প্রচার অন্যমাত্রায় নিয়ে যান। এমন দ্রুত পরিবর্তিত নির্বাচনী প্রচারের ধরন সম্ভবত তৃণমূলের পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের মস্তিষ্কপ্রসূত। অজস্র অর্থ ব্যয় করে রাজ্যের পথে পথে 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' হোর্ডিংগুলি বাঙ্গালী সেন্টিমেন্টে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করেছিল বলেই অনেকের অভিমত। একদিকে চরম আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং অন্যদিকে আগ্রাসী পথে স্বাজাত্যভিমানের ব্যাপক প্রচার। রাজ্যের মানুষ বিজেপি বিরোধী মানসিকতার প্রকাশ ঘটায় তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটি আদ্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত দালালকে বিপুল সমর্থন জানিয়ে।

রাজ্যের বামপন্থী দলসমূহের সম্মিলিত মোর্চা বামফ্রন্ট অবশ্যই আত্মবিশ্বাসের চরম অভাবে ভুগছে অনেক কাল। নিজেরা এককভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে তেমন কোনও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় থাকতে পারবে বলে আর মনেই করছিল না। বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির সংগঠনিক শক্তি অনেককাল যাবৎ ক্ষয়প্রাপ্ত। নানাকারণে এই ক্ষয়রোগ কমবেশি সবকটি দলকেই আত্মবিশ্বাসহীন করে তুলেছিল।

তাছাড়া তৃণমূল জমানায় নির্বাচনী ব্যয় এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে অধিকাংশ বামদলগুলিই তা বহন করতে পারছে না। এটা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এবারের বিজেপি-তৃণমূল দ্বৈরথে যে কত হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে জানা নেই।

অতীতের সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা :

দীর্ঘকাল রাজ্য সরকার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বামপন্থী দলগুলির অনেক নেতা কর্মীই একসময় মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, তাঁদের অবস্থান অপরিবর্তনীয় ও চূড়ান্ত। এই অবস্থান থেকে তাঁদের হটিয়ে দেবার মতো রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠা বাস্তবে অসম্ভব। অতএব, আশঙ্কামুক্ত শরিক দলগুলি আত্মকলহে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। কার কত শক্তি তা মাঠে ময়দানে মারামারি খুনোখুনি করে প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্র সব কর্মকাণ্ড চলতে শুরু করেছিল। এ প্রসঙ্গে খুব নরমভাবে বললেও রাজ্যের সর্ববৃহৎ বামপন্থী দল সি পি আই (এম) এর ভূমিকা অবশ্যই অনুজ্জ্বল হিসেবে প্রতিভাত হয়। সরকার পরিচালনায় মুখ্য দায়িত্বই শুধু নয়, রাজ্য পুলিশ বাহিনীর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কবজায় থাকার জন্যই বহুসংখ্যক বাহুবলী এই দলটির নানা স্তরে শক্তিশালী সাংগঠনিক ভূমিকায় পর্যন্ত চলে যায়।

এই উদ্ধত বড়দাদাসুলভ মানসিকতার প্রকাশ ঘটে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সাংগঠনিক প্রভাব বলয় গায়ের জোরে দখল করে নির্মম আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার অনৈতিক প্রয়াসে। নির্মোহ বিচারে লক্ষ করা অসম্ভব নয় যে, অ-বামপন্থীসুলভ এক চরম কর্তৃত্ববাদী ভূমিকায় সর্বব্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অদম্য বাসনাকেই বিপ্লব সংঘটনের পন্থা হিসেবে একাংশ হয়তো মনে করতে শুরু করেন।

এমন নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্ববাদী প্রকল্প শুধুমাত্র অন্যান্য বামদলগুলির ক্ষেত্রেই সীমিত থাকেনি। ব্যাপক অংশের জনসাধারণকেও আজ্ঞাবাহক হিসেবে পরিগণিত করার মানসিকতাও পেয়ে বসে। নানা নামে 'কমিটি' গঠন করে জনসমাজের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত স্তরের মধ্যেও দখলদারি স্থাপনের উদ্ভট কাজকর্মের উদাহরণ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নয়।

মানুষকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো মনে করা এক ভয়ঙ্কর ব্যাধি। কৃতদাসদের শাসনের নিগড়ে বেঁধে ফেলার মধ্যে এক বিকৃত মানসিকতা কোন কোন রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীকে একধরনের মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে! মানুষের সমাজ গঠন বিশেষ করে, 'রাষ্ট্র' গঠনের পরবর্তীকালের সহস্র বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে কোন কোন কালে এমন মানসিকতার কু-প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে।

এই মনোভাব সর্বতোভাবেই চূড়ান্ত মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিচারে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এতদসত্ত্বেও বিশ্বের নানা দেশে মার্কস-লেনিনের উন্নত মতবাদ প্রয়োগের নামে এমন অঘটন একান্ত বিরল নয়। বুর্জোয়া বা তার পূর্বে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন কুৎসিত অবমনুষ্যত্বের প্রকাশ অহরহ ঘটেছে। যত দুর্ভাগ্যজনকই হোক, বামফ্রন্টের প্রশাসন পরিচালনাকালে এমন ব্যতিক্রমী ঘটনা নানাভাবে ঘটেছে। সবটাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুসারে হয়েছে, এমন কথা না বলাই শ্রেয়। অনেকক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্তরের মাতব্বররাও নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে উর্দ্ধতন নেতৃত্বের প্রশংসাধন্য হবার জন্যও এমন অপকর্ম করে গেছেন। 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি'— এমন একটি আপ্তবাক্য মনে আসে। বামদলগুলির কোন কোন শীর্ষস্থানীয় বা প্রভাবশালী নেতা হয়তো কানে শুনে বিশ্বাস করেছেন। প্রকৃত অবস্থাটি পর্যবেক্ষণ বা পর্যালোচনা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ইত্যাকার ঘটনাবলী থেকে ক্রমে যে জনবিচ্ছিন্নতা বেড়ে চলেছে সে সম্পর্কে যথাসময়ে সুচিন্তিত এবং নির্মোহ সক্রিয়তা এবং যেভাবে তা অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো, দুঃখজনকভাবে তা পুরোপুরি কেন, আংশিকভাবেও হয়েছে বলে মনে হয় না। যেসব মানুষকে নানা কারণে আধিপত্যবাদী মানসিকতা গ্রাস করে, তারা সততই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো আচরণ করেন। তাঁদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মতো সর্বব্যাপী অঘটন না ঘটলে বুঝিয়ে ওঠা অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী চিন্তাভাবনা ও ভাবাদর্শের প্রসারে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছিলাম। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনকালে তো বটেই এমনকি, ২০১১ সালে আমাদের নির্বাচনী পরাভবের পরেও এমন ভাবনা বেশ কিছুকাল অটুট ছিল। রাজ্যে বামশাসন কালের শেষদিকে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময়কাল জুড়ে আমাদের কাছে উৎসবমূলক কর্মকাণ্ডগুলিতে অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণ আমাদের আহ্লাদিত করতো। আমরা প্রভূত স্বস্তি বোধ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। আমরা অনেকেই সম্ভবত খেয়াল করিনি যে, সেইসব জনসমাবেশগুলি স্ফীত হয়েছিল মুখ্যত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিক্যে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিশাল ব্যাপ্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে বিভিন্ন পরিষেবামূলক বৃহদাকার শিল্পগুলিতে সংঘবদ্ধ চাকুরিজীবি মানুষের ঢল নামতো আমাদের কর্মকাণ্ডগুলিতে।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিজীবি অংশ অধিক সংখ্যায় তাঁদের উপস্থিতি জানান দিতেন। এই অংশের মানুষদের মধ্যে বামপন্থার প্রতি প্রবল আনুগত্যের প্রতিযোগিতা চলত। বিদ্যালয়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অশিক্ষক, কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ আমাদের বিশেষভাবে আহ্লাদিত করত। এইসমস্ত মানুষদের সকলেই রাজ্য সরকারের ওপর আমাদের কর্তৃত্বের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়ছেন এমন কথা উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ হবে। আবার এ কথাও অনস্বীকার্য যে, এই অংশের মানুষরা সকলেই মার্কসীয় বীক্ষার মূল সন্দর্ভ শ্রেণি সংগ্রামের অপরিহার্যতা সম্পর্কে মোটেই আস্থাশীল ছিলেন না। কিন্তু এমন মানসিকতা বিভিন্ন বামপন্থী দলে বেশ গুরুত্ব পেয়ে যায়। এরা দলের সমর্থক থেকে ক্রমে প্রায় এক অর্থে নেতৃত্বের স্তরে অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পান।

নয়া উদারবাদ ও বামফ্রন্ট :

সুবাতাস প্রায় সবসময়েই কু-বাতাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিধ্বংসী ঝড়ঝঞ্ঝার উপক্রম ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে সর্বব্যাপ্ত শ্রেণি আন্দোলনের অভাব বা অনুপস্থিতি রাজ্যের শ্রমজীবি অংশের বহু মানুষকে মূল মঞ্চে বেশ কিছুটা ব্রাত্য করে ফেলে। ব্যাপক আন্দোলনহীনতা এবং শুধুমাত্র যত্নের সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রশাসন পরিচালনাই মুখ্য হয়ে পড়ে।

এরপর ৪-এর পাতায়

২১শে'র নির্বাচন—কিছু ভাবনা

৩-এর পাতার পর

কৃতিত্বের সঙ্গে এই কাজ করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শেষতম আশ্রয় নয়া উদারবাদী প্রকল্পগুলির কাছে বিবশ হয়ে পড়ার উদাহরণ অপ্রতুল নয়।

নয়া উদারবাদ অবশ্যই গণতন্ত্র বিদ্বেষী। শ্রমিক শ্রেণির ওপর প্রশ্নহীন শোষণ ও বঞ্চনার বোঝা চাপিয়ে দিতে না পারলে ওইসব প্রকল্পগুলি কোনও সার্থকতা খুঁজে পায় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সত্য বারংবার অনুভূত হয়েছে। ১৯৯১ সালে যখন, এদেশে নয়া উদারবাদের উদ্ভব ঘটে তখন, এমন আশা সঙ্গত কারণেই বামপন্থীদের মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল যে, দেশের সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের প্রত্যক্ষ ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে এই বিষাক্ত প্রকল্পকে অনেকটা প্রতিহত করা যাবে। বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, যাদের মুখ্য পরিচয় শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থ রক্ষায় একান্তভাবে নিহিত এবং যে সরকার সারা দেশের শ্রমকারী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তার মধ্যেই এমন ব্যতিক্রমী পথে চলা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। রাজ্যের শ্রমজীবি মানুষদের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে পশ্চাদপদ অংশের মানুষদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার শুরু সেখান থেকেই নয়তো!

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব হতে পারে ভেবে বামফ্রন্টের একাংশ যত্নের সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করার সাধনায় যত্নশীল হয়েছিলেন। পুঁজিবাদ বিশ্বায়িত রূপ নিয়ে সাধারণ জনসমাজকে বিধ্বস্ত করে চলেছে। ২০০৭-০৮-এর বিশ্বব্যাপী সংকটের পরে এই আক্রমণের হিংস্রতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের যদিও বা কিছুটা নরম বা প্রগতিশীলতার চিহ্ন ছিল, একবিংশ শতকে তা পূর্ণত অপসৃত। সংকট বড় বালাই।

এমন আগ্রাসী পুঁজিবাদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি বামপন্থীদের জানা ছিল না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু অনেকেই যান্ত্রিকভাবে অধীত বিদ্যা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথে বিচরণ করেন। জনবিচ্ছিন্নতা ধারাবাহিক হয়ে পড়ে। সেই বিচ্ছিন্নতার রেশ আরও কতদিন চলবে তা, গুণে গেঁথে বলে দেওয়া সম্ভব নয়।

বাস্তবে যে সমস্ত মানুষ ক্রমাগত লড়াই করে বাঁচতে শিখেছিলেন তাঁরাই প্রকৃত লড়াই-এর আবহ অবলুপ্ত হবার পর ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে জীবনধারণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ২০১১র পর থেকে তৃণমূল সরকার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই উচ্ছিষ্ট বিতরণ করতে শুরু করে। যাঁরা এক সময় অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উন্নততর জীবনবোধের সাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক আপত্তি ও প্রতিরোধের ইচ্ছা প্রকাশ পেলেও তা, পূর্ণতা পায় নি। ক্রমে এই অংশের অনেকেই উচ্ছিষ্টভোজীতে পরিণত হয়ে পড়েন। তৃণমূলী অপশাসনের দীর্ঘ দশ বছর পরে উচ্ছিষ্ট নির্ভর জীবনধারণে অনেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। নীতি আদর্শ প্রভৃতি পরিত্যক্ত।

দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক একবার জাঁকিয়ে বসলে গ্রহীতারা দাতার নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেই মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে পড়েন। তাঁদের মননে অধিকারবোধ অবলুপ্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে এই মনোভাব আপাতত প্রায় স্থায়ী হয়ে পড়েছে। মনোবল সংহত করে অধিকার আদায়ে সংগ্রামের পরিবর্তে দাক্ষিণ্য নির্ভর জীবন চর্যাকেই অনেকে শ্রেয় বলে মনে করতে থাকেন। সহজেই যা পাওয়া সম্ভব তা, অবহেলা করে অসম্ভবের পথে চলতে আর কে চায়? এই রাজ্যে ব্যাপ্ত কর্মহীনতা, শিল্প উদ্যোগ গড়ে তুলে সসম্মান জীবিকার সন্ধানে আন্দোলনে সামিল হতে যে মানসিকতা একান্ত প্রয়োজন তা, ক্রমে অবলুপ্ত হয়। বামপন্থীরা অধিকারের কথা বলেন। দাক্ষিণ্য বিতরণে তাঁদের কোনও ক্ষমতা নেই। তাঁরা নেই অফুরন্ত অর্থের পাহাড়ের শীর্ষদেশে। তা ছাড়া, এবার নির্বাচনকালে বামফ্রন্ট এবং সংযুক্ত মোর্চা যে ইস্তেহার বা আবেদন প্রকাশ করেছে তার কোথাও 'শ্রী'র ঘোষণার কথা নেই। নেই বিনিপয়সায় অনেক কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন অধিকার প্রদানের বিষয়। সসম্মান চাকুরি, নিয়মিত টেট, এস এস সি প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং টাকা পয়সার বিনিময়ে নয়, যোগ্যতার নিরিখে শিক্ষক শিক্ষিকার স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থার নিশ্চয়তা। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, পরীক্ষায় বসে যোগ্যতা অর্জন অবশ্যই পরিশ্রমসাধ্য। বিপরীতে আরামে আয়েসে কাটমানির ভাগ নিতে কিংবা সিন্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত হতে তেমন কোনও অধ্যবসায় বা পরিশ্রম নেই। সাধারণভাবে অনেকেই দ্বিতীয় পথের সন্ধান করেছেন।

অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গটি অবশ্যই দীর্ঘ সংগ্রামের। বহুকাল আন্দোলনহীনতা সাধারণের মননে যে জাড্য নির্মাণ করেছে তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। ভয় আছে অধিকারের সংগ্রামে মইদুল মিদ্দা হয়ে যাবার। চেতনার উন্নত পর্যায়ে সাধারণ মানুষ এমন ঝুঁকি নেয়, নয়তো নয়। অবশ্য আন্দোলন সর্বব্যাপী হলেও মানুষ এগিয়ে আসে।

এত বিভিন্ন প্রসঙ্গ এই রচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রায় সবগুলিই পৃথক পৃথক ভাবে লেখার বিষয় হতে পারে। বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কোনও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হতে সময় লাগবে। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়োজন যেমন নেই তেমনি, বাস্তব সম্ভাবনাও নেই। নির্বাচনের ফলাফলে বামপন্থীরা বিপর্যস্ত হয়েছেন। সন্দেহ নেই এমন বিপর্যয় স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে কখনোই হয় নি। এমনকি ১৯৭২-এর সেই চরম লজ্জাজনক রিগিংকালেও হয়নি। সেবারেও বেশ কয়েকজন বামপন্থী জিতেছিলেন। স্বাধীনতার আগেও ভারত শাসন আইনে ১৯৩৭ এর নির্বাচনে বা পরবর্তীকালে ১৯৪৬ -এর ভোটে বামপন্থীরা জিতেছিলেন।

সময় এক জায়গায় থেমে নেই। বামপন্থার অগ্রগমণকে যে কোনও মূল্যে স্তব্ধ করতে বিশ্বপুঁজিবাদ নিরন্তর অপচেষ্টা করেই চলেছে। বামপন্থীদের হতমান করার প্রকল্প আন্তর্জাতিক। ভারত তার বাইরে নয়। এখন অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে কপট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নিবিড় বোঝাপড়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এখন উতলা হয়ে উঠলে চলবে না।

এখন, এই জটিল সময়ে শান্ত থাকার সময়। শান্ত থাকার অর্থ নির্বিকল্প সমাধি নয়। আরও গভীর বিশ্লেষণ ও অন্বেষণ প্রয়োজন। নানাজনের মতামত গ্রহণ করে আগামী দিনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই চলবে না। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিশ্রমসাধ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হবে।

শূন্য হয়ে যাবার শোকে বিলাপ করে মুহ্যমান হয়ে পড়ার কোনও অর্থ নেই। জয়ে লাগামহীন উচ্ছ্বাস আর পরাজয়ে ভেঙে পড়া যথার্থ মার্কসবাদীদের পরিচিতি বহন করে না।

উন্নয়নের নামে ধারাবাহিক প্রবঞ্চনা

বলা যায় দেশ জুড়েই একটি প্রচারের ঢেউ তুলতে সমর্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অবিসংবাদী নেত্রী বলে পরিচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিষদগণ। রাজ্যে তো কথাই নেই। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে অবিরত প্রচার চলেছে রাজ্যের অসাধারণ উন্নয়নের। এমন উন্নয়নের পালে প্রবল ঝড় তুলেই তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পারিবারিক সম্পত্তির মতো রাজনৈতিক দল, তৃণমূল কংগ্রেস-এর নানা স্তরের অগণিত নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে হিংস্র দৌরাত্ম্য এবং প্রবল দুর্নীতির অভিযোগ। সেসব তুচ্ছ হয়ে গেছে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দলের বিপুল সংখ্যক আসন লাভে। ভোটে জিতে যাওয়া মানেই সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি এবং নতুন ভাবে একই কু-কর্ম করে যাবার লাইসেন্স! এবারের ভোটে জিতে যাঁরা বিরোধী দলের তকমা পেলেন তাঁদের প্রকৃত পরিচয় এমনই ভীতিজনক এবং সারা দেশে তাঁদের নেতৃত্বে যে নরকের বিস্তার ঘটেছে তা, এমনই আতঙ্কজনক যে, তুলনামূলক বিচারে তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে ঠাউরেছেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। ভাল মন্দর বিচার তো আপেক্ষিক। মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়ন ভাবনা যে, আদৌ সর্বজনীন নয় তা, এখন আর প্রশ্নবোধক প্রসঙ্গ নয়।

অগণন প্রশ্ন তোলার অবকাশ এক্ষুণি নেই। সেসব তুললেই পাল্টা মন্তব্য হবে—বামপন্থীরা ভোটের নিরিখে বিপর্যস্ত হয়েই এমন সব কথা বলছেন! প্রসঙ্গটি একটি সাধারণ বিষয়ে আবদ্ধ করাই আপাতত ভাল। এই রাজ্যের যেসব পরিকাঠামোগত উন্নয়নগুলি অতীতে সম্ভব হয়েছিল, যেগুলির সঙ্গে সাধারণ জনসমাজের নিবিড় চাহিদা যুক্ত ছিল সবটাই বিগত এক দশকে নিদারুণ অবহেলায় কেন ধ্বংস হয়ে চলেছে? অন্য অনেককিছুই বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যদি রাজ্যের অসংখ্য সেতু, ফ্লাইওভার, রাস্তা ইত্যাদি নিয়ে নিবিড় আলোচনা করা হয় তাহলে, উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন নয় যে, চলমান রাজ্য সরকারের দুষ্কৃতিসুলভ অপরাধ সংঘটিত হয়ে চলেছে। নতুন করে নিশ্চিতই পথঘাট নির্মাণ এবং সেতু প্রভৃতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু তার অর্থ এমন হতে পারে না যে, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সেতু প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস করে ফেলা হবে।

অন্যান্য বহু উদাহরণ না উল্লেখ করে কেবলমাত্র কলকাতা শহরেরই একাধিক সেতু বা ফ্লাইওভার সময়মতো সংস্কার এবং মেরামতির অভাবে আচমকাই ভেঙে পড়েছে। একাধিক মানুষের জীবনহানি হয়েছে।

বড়বাজার বা পোস্তার নির্মীয়মান ফ্লাইওভারটি আচমকা ভেঙে পড়ায় বহুমানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। সেইসময় স্থানীয় বিধায়ক এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। তদন্ত করে সবটাই প্রকাশ্যে আনা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, অতি নিম্নমানের সিমেন্ট বালি লোহা ইত্যাদির ব্যবহারে এই বিপুলাকার সেতুটি ভেঙে পড়ে। তার পর অনেককাল অতিবাহিত। রাজ্যের কেউ জানেন না সেই তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ ও মতামত কী! কালের গতিতে তা চাপা পড়েছে। হতভাগ্য মৃত মানুষদের পরিবারগুলিকে কোনও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে কিনা তা-ও জানা নেই। অল্প কিছুকাল আগেই মাঝের হাট উড়ালপুল বা টালা অঞ্চলে হেমন্ত সেতু ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। রাজ্যের বহুস্থানে এমন অনেকগুলি পুল ভেঙে পড়েছে। সবক্ষেত্রেই এমন আচমকা ভেঙে পড়ার কারণ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। সেচ বা পূর্ত মন্ত্রক তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। আবার অনেকে মনে করেন যে, নিয়মিত মেরামতি বা রক্ষণাবেক্ষণে কোনও বিজ্ঞাপন হয় না। নতুন নামকরণ সম্ভব হয় না। অনেকে বলেন নতুন কাজ করে কন্ট্রাক্টার মারফৎ থোক টাকার কাটমানিও আদায় করাও সম্ভব হয় না। সুতরাং, নতুন পুল ইত্যাদি নির্মাণ করাই শ্রেয়। তৃণমূল সরকারের এমন জনগণকে ঠকিয়ে চলার পদ্ধতি তো এবারের নির্বাচনে মান্যতা পেয়েই গেল! রাজ্যের মানুষ বুঝে না বুঝে অথবা অন্য বাধ্যবাধকতার জন্য সেই প্রবঞ্চকদেরই বিপুল ভোটে জিতিয়ে দিয়েছে। অতএব, এমনই চলবে। পথ পরিবর্তনের কোন দরকার নেই।

পিঁপড়েখালির পুল ভেঙে পড়ল :

ভোটের ডামাডোল মিটতে না মিটতেই সুন্দরবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নদী সেতু হঠাৎই ভেঙে পড়ল। বাসন্তীর চড়াবিদ্যা ও সন্দেশখালির রামপুর অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী ইস্পাতনির্মিত পুলটি ভেঙে পড়ে গত ৭ মে। যতদূর জানা গেছে, একজন মানুষের নাকি প্রাণহানি ঘটেছে। ওই অঞ্চলের বাসিন্দা এবং আর এস পি'র কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা কম. সুভাষ নস্কর সোচ্চারে অভিযোগ করেছেন যে, একান্ত অবহেলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ১৯৯৯ সালে নির্মিত পিঁপড়েখালি নদীর ওপরের পুলটি ভেঙে পড়েছে।

কম. নস্কর জানিয়েছেন যে ১৯৮২ সালে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হবার পর অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বার্থে একটি কাঠের পুল তৈরি করা হয়। তাঁর কেন্দ্র বাসন্তীর চড়াবিদ্যা আঠারোবাঁকি, মঠের দিঘি, কালিকতলা প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েক লক্ষ মানুষের ক্ষেতের ফসল ও পুকুর বিলের মাছ নদীর ওপারে সন্দেশখালির রামপুর বাজারে নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য হয়। আঞ্চলিক অর্থনীতির বিশেষ উন্নয়ন সম্ভব হয়। এই কাঠের পুলটি ওই অঞ্চলের সাধারণ গরীব গুর্বো মানুষগুলির অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব করে। অতি অল্প অর্থের বিনিময়ে তেমন কোনও বিজ্ঞাপন ছাড়াই কম. সুভাষ নস্করের উদ্যোগে এই সর্বজনীন উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল।

বাম আমলে কাঠের পুলটির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত হলেও নোনা জল ও বাতাসে পুলটির অস্তিত্ব এক সময় সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে সুভাষবাবুই নানাভাবে একটি সুস্থায়ী পুল নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯৯০ দশকের শেষদিকে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে এই নদীটির ওপর স্থায়ী পুল নির্মাণের জন্য আবেদন জানানো হয়। তৎকালীন মন্ত্রী কম. কান্তি গাঙ্গুলী প্রত্যক্ষভাবে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সুভাষবাবুর আবেদনের ভিত্তিতে পুরোনো কাঠের পুলের পরিবর্তে একটি ইস্পাতের পুল তৈরি হয় ১৯৯১ সালে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী এই পুলটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং সেচ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে পিঁপড়েখালি নদীর ওপর এই পুলটি স্থানীয় জনগণের কাছে বিশেষ আশীর্বাদ হিসেবে প্রতীত হয়েছিল। বাম আমলে পুলটির রক্ষণাবেক্ষণে কোনও খামতি ছিল না। কিন্তু ২০১১-র পর থেকে সামান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে চরম গাফিলতির জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। অঞ্চলের সাধারণ মানুষ চরম সংকটে। এখন শোনা যাচ্ছে, পিঁপড়েখালি নদীর ওপর আনুমানিক ১১ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কবে তা বাস্তবায়িত হবে বলা যায় না। রাজ্যের সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত তহবিল থেকে এত অর্থব্যয় করার প্রয়োজন পড়তো না, যদি ভেঙে পড়া সেতুটি অনেক কম খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। এসব ভাল পরামর্শ শুনবে কে?

বাজার অর্থনীতির টোটকা আজ অচল

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

২০ হাজার কোটি টাকার সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পকে অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অতিমারি বহু মানুষের প্রাণঘাতী হয়ে আসুক, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজপ্রাসাদ গড়া চাই। আগামী বছরের মধ্যেই নাকি এই কাজ শেষ করতে হবে। বিকাশই বটে! গ্রামের খাল বিলে সাঁকো বানাতে যেদেশে বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, সেদেশে অতি দ্রুততার সঙ্গে বানাতে হবে সুরম্য প্রাসাদ। কেবল মন্ত্রী, রাজা-উজিররাই নন, নিরাপত্তার নামে সেখানে থাকবে নাকি রাষ্ট্রের আরও দপ্তর। আদালতটাকে সেখানে টেনে নিয়ে এলেই বোধহয় ষোলকলা পূর্ণ হত। এক দেশ-এক সুর। সত্যিই তো খুব দরকার রাজসভার বড় প্রাসাদ। সভাতে অনেক জরুরি আইন করতে হবে, নীতি নিতে হবে। যেমন করে, গতবছর অতিমারির মধ্যেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য থেকে বাদ পড়ল খাদ্যদ্রব্য। আইনটাই উঠে গেল। রাজতন্ত্রের রাজসভার মতোই আজকের সংসদ। আমার আপনার ভোটে জেতা সরকার আমাদেরই ভাতে মারার আইন আনবে, ষড়যন্ত্র হবে, তাকে অর্থনীতির বিকাশ বলে চেল্লাবে কিছু রাষ্ট্রপোষিত পণ্ডিত। এসব রাজকর্ম করার জন্য অত্যাধুনিক প্রাসাদ ছাড়া চলে? আজকের গণতান্ত্রিক রাজা অতি নিরাপত্তায় পাতাল পথে প্রাসাদ থেকে সভায় যাবেন। আর ভোটের সময় আকাশপথে দেশ ঘুরে ভাষণ দেবেন।

সেন্ট্রাল ভিস্তাকে যখন আবশ্যক বলা হচ্ছে, তখন দেশের হাজার মানুষের প্রতিদিন করোনায় মৃত্যু হচ্ছে। নতুন হাসপাতাল না শ্মশান-কবরস্থান আরো অনেক বানানো অত্যাবশ্যক তাই এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সব দায় নাগরিকের ওপর চাপিয়ে রাজা-গজার দল নিজেদের ধান্দার কাজেই মত্ত। শুধু কি সরকার। রাষ্ট্রের অন্যান্য স্তম্ভের কাজও তো সেই সুরে কথা বলা। মিডিয়া ব্যস্ত প্রজা নয়, রাজাকে বাঁচাতে। আদালত সরকারের উদ্দেশ্যে কড়া কড়া কথা বলছে, চূড়ান্ত অব্যবস্থাকে গণহত্যার সঙ্গেও তুলনা করছে। কিন্তু গণহত্যাকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা কোথায়? সরকার পক্ষের উকিল দিব্যি মিথ্যাচার করে যান। গত বছর যখন রাস্তায় শ্রমিক মারা যাচ্ছিলেন, তখন বলেছিলেন একজন 'পরিযায়ী' শ্রমিকও নাকি রাস্তায় নেই। এখন যখন রাজপথে মৃতদেহের সারি, তখন তিনি দিব্যি আদালতে তা অস্বীকার করেন। সেই মিথ্যাচারের শাস্তি নেই।

বর্তমান রামরাজ্যে বিচারক অবসরের পরেই সাংসদ হন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অবসরের দু'দিন মধ্যেই রাজ্যপাল হয়ে যান। দেশ ও রাজ্যের মন্ত্রীরা নির্বাচনী সভায় ভিড় দেখানোর প্রতিযোগিতায় মেতে আবার করোনার জন্য ভিড় না করার জ্ঞান দেন। চূড়ান্ত কপটতা ও মিথ্যাচারের এই রাজকার্যে এত মানুষের মৃত্যু গণহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ থেকে বাঁচতে নাগরিকদের জ্ঞান দিয়েই সরকার দায় সেরেছে। নিজে কোনো দায়িত্ব পালন করে নি। এক বছরের মধ্যে এই অতিমারি মোকাবিলায় অনেক কিছুই করা যেত। করা যেত হাসপাতাল, সকলকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা, অক্সিজেন জোগানের ব্যবস্থা। রেশনের মাধ্যমে সকলের পেটভরা পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তাও দেওয়া যেত। তার বদলে রেশন ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটানোর জন্য আইন হয়েছে। এখন বলছে খাদ্য নিরাপত্তা আইন বদলাবে। বড় বেশি মানুষ রেশন পাচ্ছেন।

লকডাউনে মানুষের আয় ও কাজের নিশ্চয়তার পরিকল্পনা করা যেত। সরকার সেসব কিছুই করে নি। বরং শ্রমবিধি চালু করে ছাঁটাইয়ের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। অসহায় মানুষকে ঠেলে দিয়েছে বাজার অর্থনীতির হিংস্র থাবার সামনে। চাহিদা-জোগানের খেলায় যেখানে নির্ধারিত হবে লাভ-ক্ষতির সংখ্যাতত্ত্ব। সংক্রমণ যত বাড়বে, তত টিকার চাহিদা বাড়বে। তখন সকলকে টিকা দেওয়ার দায়িত্ব না নিয়ে সরকার ব্যবসার সুযোগ করে দেবে। দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিনামূল্যে টিকা না দিয়ে ধ্বংসের মুখে ফেলা হচ্ছে। টিকা সরবরাহের চূড়ান্ত অব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার কালোবাজারির সুযোগ করে দিচ্ছে।

এখন মৃতদেহ সৎকারেও কালোবাজারি হচ্ছে। সরকারের কোনো দায় নেই। পি এম কেয়ার্স ফান্ডের অর্থে এই এক বছরে কী কী করা হল তাও জানা যাবে না। কারণ এর হিসেব কার্যত গোপনীয়। যেমন গোপনীয় এই অতিমারিতে মুনাফার সুযোগ করে দিতে সরকার-কর্পোরেট মিতালি। বাজেটে নাকি স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ অনেক বেড়েছে। আসলে পাঁচ বছরের পরিকল্পনা এক বছরে ঢুকিয়ে, স্বাস্থ্যখাতে অন্য বরাদ্দের অর্থ ঢুকিয়ে নাগরিককে ঠকানো হয়েছে। মানুষ যখন মরছে, তখন সরকার ব্যস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠরোধ করতে। দেশের মানুষের একটা বড় অংশকে স্রেফ মেরে ফেলো। ১৩০ কোটির দেশে সকলের বাজার নিয়ে ভাবার দরকার নেই। তারা চাহিদা-জোগানের খেলার বাইরে। নিছকই সস্তা শ্রমের জোগানদার।

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকার না নিলে অতিমারির মোকাবিলা যে করা যায় না, তা আজ প্রমাণিত। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিও মোকাবিলা করতে পারে নি। খোলা বাজারের প্রধান প্রচারক আমেরিকাও টিকা, অক্সিজেন প্রভৃতি দেশের জন্য মজুত রেখেছে। তার বিশ্বস্ত মোড়ল ইসরায়েল সকলকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিউবা, ভিয়েতনামের মতো দেশ গত বছরেই দেখিয়ে দিয়েছিল সরকারি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিভাবে করোনার মোকাবিলা করতে পারে। আর খোলা বাজারের খাঁটি 'কারিয়াকর্তা' মোদি সরকার নাগরিককে কেবলই মনের কথার নামে জুমলা গিলিয়েছে। স্বাস্থ্যবীমার প্রচারে মানুষ ভুলিয়েছে। তলে তলে সঙ্কটে কিভাবে বিভিন্ন কোম্পানি ব্যবসা করতে পারে তার ফন্দি করেছে।

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা। নয়া উদারনীতির যুগে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে নিজেদের হাত গোটাতে সরকার একের পর এক প্রকল্প করেছে। এই পাপ কাজ মোদির আমলে নয়, শুরু হয় ১৯৯১ সালের পরেই। সেই স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারি কর্মচারির স্বীকৃতি তো দূরের কথা, যথাযথ আর্থিক-সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত করা হয় নি। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেড়েছে চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী নিয়োগ।

বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসার সুযোগ করে দিতে ধ্বংস করা হয়েছে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা। তাই ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগেরই মোকাবিলা করা যায় না। করোনা অতিমারির সময়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা সরকার ইচ্ছে করেই করে নি। অতিমারি যে অতি ধনীদেরও রেহাই দেয় না তা করোনা প্রমাণ করেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা আসলে সামাজিক। তাকে বাজারের হাতে ছেড়ে, সমাজ বিচ্ছিন্ন করলে বাজার অর্থনীতির কুশীলব আর তার দালালরাও ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।

সস্তা শ্রমের বাজার তৈরির প্রতিযোগিতায় এক বছর অনেক কদম এগিয়ে গেছে মোদি সরকার। গত বছর 'পরিযায়ী' শ্রমিক মৃত্যু দেখেও সরকার এদের কথা ভাবে নি। বরং একশো দিনের প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়েছে। যে দেশের জনসংখ্যার বড় অংশ তরুণ, সেদেশে লকডাউনে সকলের শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থার ভাবনা নেই। ভাবনা নেই এই মন্দায় উপার্জনের ব্যবস্থা করার। তাদেরই এখন টিকা কিনতে হবে খোলাবাজারে!

অর্থনীতির যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ দিয়ে দেশের উন্নয়ন বা বিকাশের বিচার হবে। যে বিচার কেবলই সংখ্যার হিসেব। অর্থনীতির চর্চা যেন অঙ্ক। অথচ, অর্থনীতি আসলে সমাজবিজ্ঞান। সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। পুঁজিবাদ অর্থনীতি চর্চাকে সমাজ বিচ্ছিন্ন করে কেবলই গণিত নির্ভর করেছে। পুঁজি কেন্দ্রীভবনের নেশায় মানুষকে ব্রাত্য করতে করতে ভুলেই গেছে, মানুষকে বাদ দিয়ে মুনাফা হয় না। মানুষের হাতে অর্থ না থাকলে চাহিদা কমতে কমতে অর্থনীতিই মুখ থুবড়ে পড়ে। চাহিদা-জোগানের ভারসাম্যের তত্ত্ব দিয়ে এই মন্দাকে মোকাবিলা করা যায় না।

সংক্রমণের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে এখন গভীর চর্চা চলছে। গণিতজ্ঞরা হিসেব কষে দেখিয়ে দিচ্ছেন আগামীদিনে সংক্রমণ কত হবে, তৃতীয় ঢেউ আসার সম্ভাবনা কতখানি—যেন সবই ভবিতব্য। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কিছুই করার নেই। আমরা অসহায়। অথচ, জীবনকে বাজি রেখে লড়ে যাচ্ছেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে নানা প্রকল্পের স্বাস্থ্যকর্মীরা। করার আছে অনেক কিছুই। সেসব করার কথা রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র ব্যস্ত কোম্পানির দালালিতে। মানব সমাজের বিপন্নতা তাদের ভাবায় না। রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরও মজবুত করে পুঁজির সেবাতেই শাসকের দিন কাটে। সেন্ট্রাল ভিস্তা আসলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সদম্ভ কদর্য প্রতীক। যেখানে আগামীদিনেও গণতন্ত্রের মুখোশ পরে একের পর এক জনগণের সর্বনেশে আইন করা হবে। কিন্তু বাজার অর্থনীতির টোটকা যে আজ অচল তা প্রমাণিত। মানব সমাজকে বাঁচাতে এই টোটকা অক্ষম। মার্কসবাদ অচল প্রচার করতে করতে রাষ্ট্রনেতারা এই সত্য ভুলে গেছে। আমরাও কি ভুলে গেছি?

২০০০০ কোটি টাকার সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প স্বয়ং মোদির মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনি মাত্র কিছুকাল আগে সদম্ভে দাবি করেছিলেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভারত রুখে দিয়েছে। অতিমারী মোকাবিলায় ভারত বিশ্বগুরুর আসনে। অন্যান্য অনেক দেশ নাকি ভারতের সাফল্যে উজ্জীবিত। সেইসব দেশের রাষ্ট্রনায়করা ভারতে আসতে উদ্গ্রীব। বিশ্বগুরু বনে যাওয়া ভারত রাষ্ট্রের স্বঘোষিত গুরুজির নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। তাঁকে এখন অবশ্য অনেকেই জুমলাবাজ মোদি বলেই উল্লেখ করেন। তিনি বেশ নতুন বা অভিনব বাণী দিলেন 'স্বনির্ভর ভারত'। দেশের জল জঙ্গল জমি সহ সমস্ত সম্পদ অকাতরে বেচে দিয়ে তিনি স্বনির্ভরতার বুজরুকি দিলেন। এখন কোভিড সংক্রমণের ভয়াবহ চাপে বিশ্বের অনেক দেশের অকৃপণ সহায়তার দিকে তাকিয়ে আছেন চাতক পাখির মতো 'গুরুজি' মোদি। শুধু দাড়ি গোঁফ বাড়ালেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হওয়া যায় না। তার জন্য মোদির মতো ফেকুজিকে জন্মজন্মান্তরের সাধনা করতে হবে। তার আগে দেশের সমস্ত মানুষকে বিনি পয়সায় টিকা দেবার ব্যবস্থা করে করোনা সংক্রমণের অভিশাপ মুক্তির ন্যূনতম ব্যবস্থাটি করতেই হবে। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

কর্পোরেট স্বার্থে তৃণমূল ও বিজেপি'র ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে মানুষের স্বার্থে বামগণতান্ত্রিক ঐক্য সুদৃঢ় করুন

দাম : ১০ টাকা

বামপন্থা-সেকাল একাল

মনোজ ভট্টাচার্য

দাম : ১৫ টাকা

সংগ্রহ করুন

মোদীর কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মানুষকে বাঁচাতে ব্যর্থ

১-এর পাতার পর

সঙ্গতভাবেই দাবি করা যায় যে, রাজ্যের নানা প্রান্তে যেভাবে হিংসার ব্যাপক প্রসার ঘটে চলেছে তা, অবিলম্বে বন্ধ করার দায়িত্ব তাঁর ওপরেই বর্তায়। বস্তুত, যে কোনভাবেই হোক্ মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে শুধু মৌখিক বিবৃতি নয়, প্রশাসনকে সমস্ত স্তরে সক্রিয় করেই এই এই অবস্থার অবসান ঘটাতে তৎপর হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সামাজিকস্তরে ব্যাপক হানাহানির প্রকোপ বন্ধ করতে না পারলে নিশ্চিতই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি তার সুযোগ নেবে। সামাজিক হানাহানি ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হানাহানির মতো নারকীয় অবস্থায় রাজ্যকে ঠেলে দেবে। যে কোনও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য আচরণ এখন এক বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সবাইকেই অতি সচেতন থাকতে হবে এমন এক অপ্রীতিকর অবস্থা যাতে কোনভাবেই গড়ে উঠতে না পারে। মুখ্য দায়িত্ব অবশ্যই রাজ্য সরকারের কিন্তু সচেতন মানুষদেরও দায়িত্ব রয়েছে তা, বিস্মৃত হলে সমূহ বিপদ।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, দেশময় কোভিড সংক্রমণ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহায়। চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগও মিলছে না। রাজধানী দিল্লির পরিস্থিতি আতঙ্কজনক। অক্সিজেন-এর চরম আকাল। আর্ত মানুষ শ্বাস নিতে পারছেন না। হাসপাতালে শয্যা নেই, অ্যাম্বুলেন্স নেই, ভেন্টিলেটারের কোনও ব্যবস্থা নেই। আছে শুধু মাঝে মাঝে মোদীর মন কি বাত! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিস-এর এক শ্বেতাঙ্গ নৃশংস শ্যাভিন নামে পুলিশ আধিকারিক হাঁটু দিয়ে গলায় চাপ দিয়ে মেরে ফেলেছিল জর্জ ফ্লয়েড নামের এক নিরপরাধ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে। তিনি বারংবার আবেদন করেছিলেন 'আমি শ্বাস নিতে পারছি না'। শ্যাভিন সেই কাতর আবেদনে কর্ণপাত করেনি। মানুষটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বর্তমান ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কোভিড সংক্রমিত অবস্থায় কাতর আবেদন জানাচ্ছেন অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস নিতে পারছি না। তাঁদের অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। চরম অভাব অক্সিজেন-এর। মোদী সরকার অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবনেই ব্যর্থ। প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবার পথে চলবে কেমন করে?

দেশের কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ পেয়েও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে সচেষ্ট হয়নি। বড় বড় অমূলক বাণী দিয়েছেন। 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার ফাঁকা কথা বলে উগ্র জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসারে ষড়যন্ত্রমূলক অপচেষ্টা করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী কোভিড মোকাবিলায় বিশ্বগুরু হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার বৃথা চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হর্ষবর্ধন ১১ মার্চ পর্যন্ত সমানে অস্বীকার করে গেছেন করোনা'র দ্বিতীয় ঢেউ সম্পর্কে। আর এখন হাজার হাজার মানুষ একটু অক্সিজেনের চূড়ান্ত অভাবে অসহায়ভাবে মারা পড়ছেন। এর চাইতে হৃদয়বিদারক অবমনুষ্যত্ব আর কি হতে পারে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্পের মতো দানবীয় শক্তির পরাভবের পর খুনী পুলিশ আধিকারিক শ্যভিনের দ্রুত বিচার সমাপ্ত হয়েছে এবং তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে হাজার হাজার অসুস্থ মানুষকে বিনা অক্সিজেনে শ্বাস বন্ধ করে মারার জন্য দায়ী মোদী-শাহ'র বিচার কবে হবে? এদের অপরাধের কোনও সীমা পরিসীমা নেই। চরম অবিমৃশ্যকারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন মোদী সরকারকে শাসন ক্ষমতা থেকে টেনে নামানোর দায়িত্ব দেশের সচেতন মানুষদেরই গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বিশেষ গর্বের বিষয় যে, বামপন্থী ছাত্র-যুবরা রেড ভলান্টিয়ার্স সংগঠিত করে অসাধ্য সাধন করছেন। হাসপাতালে শয্যার ব্যবস্থা করতে মানুষ যখন নাস্তানাবুদ সেই সময়ে রেড ভলান্টিয়ার্স-এর স্বেচ্ছাসেবকরা আর্ত মানুষের পাশে। অক্সিজেনের অভাব থাকলেও তা কোনক্রমে ব্যবস্থা করছেন এইসব ছাত্রযুবরা। মানুষের জন্য খাদ্য পৌঁছে দিচ্ছেন সকাল সন্ধ্যায়। এদের প্রতি অকুণ্ঠ সাধুবাদ এবং রেড স্যালুট।

রানাঘাটে কোভিড মোকাবিলায় আর এস পি

করোনা ভাইরাসের ২য় ঢেউয়ে সাধারণ মানুষ চরম দিশেহারা ও আতঙ্ক, হয়রানির কবলে। দীর্ঘ প্রায় দু'বছর হলেও এখনও কোভিড চিকিৎসার ন্যূনতম পরিকাঠামো রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতোই রানাঘাট মহকুমায়ও গড়ে ওঠেনি।'

গত ৭ মে শুক্রবার এই অভিযোগ জানাতে রানাঘাটে আর এস পি'র উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রানাঘাট কোর্ট মোড়ে একটি সংক্ষিপ্ত সভা সংগঠিত হয়। সেখান থেকে মিছিল করে মহকুমা শসক দফতরে পৌঁছে নেতৃবৃন্দ করোনার ২য় ঢেউয়ের আগাম সতর্কতা থাকলেও তার মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিদারুণ ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করেন ও নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদি-সহ একাধিক প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বারংবার এই রাজ্য ও আমাদের জেলায় নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে একটি শব্দও ব্যয় করেননি বলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। বস্তুত বিজেপি নেতৃবৃন্দ দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে করোনার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাতে সহায়ক হয়ে পড়েন।

রানাঘাটে অবিলম্বে কোভিড হাসপাতাল, কোভিড পরীক্ষার কেন্দ্র, প্রতি ব্লকে সেফ হোম, দ্রুত কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট, লকডাউনের সময় সীমার পুনঃবিন্যাস, রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর দাবি সহ ১৪ দফা দাবি-সম্বলিত স্মারকলিপি পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসক রানা কর্মকারের নিকট পেশ করেন। আলোচনা কালে মহকুমা শাসক দীর্ঘ সময় ধরে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় রানাঘাট মহকুমা স্বাস্থ্যাধিকারিক ডা. পুষ্পেন্দু ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

কোর্ট মোড় ও মহকুমা শাসক অফিসের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আর এস পি'র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কম. সুবীর ভৌমিক, মহিলা নেত্রী কম. করবী সেন, কম. মলয় নন্দী, কম. সাধন দে প্রমুখ।

অতিমারী পরিস্থিতিতে আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদকের আহ্বান

অতিমারীর দ্বিতীয় পর্যায়ের দাপটে দেশের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে, দুর্যোগ সীমাহীন। লক্ষ লক্ষ দেশবাসী কোভিড-১৯ সংক্রমণের কবলে। প্রতিদিন হাজার হাজার মৃত্যু। অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ চিকিৎসার চূড়ান্ত অভাব। হাসপাতালগুলিতে বেড নেই। একান্ত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নেই। ভেন্টিলেটারের হদিশ নেই। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে কোনও সদুত্তর নেই।

এমন ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলার জন্যই নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টারস্ রিলিফ ফান্ড থাকলেও একটি পি এম কেয়ার্স ফান্ড প্রবর্তন করেছেন। শোনা যায় সেই তহবিলে বহু সহস্র কোটি টাকা জমা পড়েছে। কর্পোরেট কোম্পানিগুলির অধিকাংশই বিজেপি সরকারের অতি ঘনিষ্ঠ এবং বহুবিধ সুবিধাপ্রাপ্ত। তারা অনেকেই নাকি বহু কোটি টাকা দিয়ে মোদিকে সন্তুষ্ট করেছে। দেশের অনেক মানুষও অর্থদান করেছেন। দেশের মানুষ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায় কিভাবে খরচ হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব দাবি করে। এই তহবিলের আয় ব্যয় সম্পর্কে তথ্যের অধিকার আইনে কিছু জানা যায় না। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আগেই এই ফান্ডের অর্থ নয়ছয় করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা করে রেখেছে। সুতরাং দেশের মানুষের দাবি—এই তহবিলের আয় ব্যয়ের সার্বিক হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

এমন সন্দেহের বিস্তর কারণ রয়েছে যে, পি এম কেয়ার্স ফান্ডের প্রচুর টাকা বিজেপি'র নির্বাচনী প্রচারে ব্যয় হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে মোদির দল পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখলে মরীয়া। এই দলটির কার্যক্রমে স্বচ্ছতার কোন্য বালাই নেই।

নরেন্দ্র মোদি গত ২৯ জানুয়ারি ওয়ার্লড ইকনোমিক ফোরামের মঞ্চে উচ্চকিত দাবি করেছিলেন যে, করোনা সংক্রমণ রোধে ভারত সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কোভিড-১৯ অনুজীবী মুক্ত ভারত অন্যান্য বহু দেশকেই পথ দেখাচ্ছে। বর্তমান সময়ে অতি আতঙ্কজনকভাবে ভারত জুড়ে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপর্যয় গভীর। বিভীষিকাময় অতিমারীর কোপে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। এমন অবাস্তব দাবি কেন করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী তার জবাবদিহি করার দায়িত্বও তাঁর ওপরেই বর্তায়। দেশের মানুষকে তো বটেই, বিদেশের মানুষদেরও তিনি প্রতারিত করে চলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী দাবি করেছিলেন যে ভারতে দু'টি টিকা প্রস্তুত হচ্ছে। আরও বেশ কয়েকটি টিকাও প্রস্তুতির পথে। তিনি দাবি করেছিলেন যে, সমস্ত দেশই ভারতের এমন উজ্জ্বল ভূমিকায় উজ্জীবিত। এমন দাবিও এক লজ্জাজনক জুমলা। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন উচ্চারণ প্রত্যেক ভারতীয়র কাছেই লজ্জার। এই চরম দুর্যোগপূর্ণ অতিমারী কালে ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৮.৪ শতাংশ টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন আর মাত্র ১.৫ শতাংশ দুটি ডোজ পেয়েছেন। অর্থাৎ দেশের জনগণ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথমবার মানুষকে টাকা খরচ করে প্রতিষেধক টিকা নিতে হচ্ছে। টিকাকরণের ব্যয়ও অত্যাধিক বেশি এমনকি, আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ অপেক্ষাও বেশি। মোদী সরকার নির্লজ্জের মতো অতিমারী মোকাবিলার সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করছে। এ এক নির্মম ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

ভারতের দুর্ভাগ্য সাধারণ মানুষ হাজারে হাজারে অসহায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, যথাযথ প্রক্রিয়ায় মৃতদেহগুলি সম্মানের সঙ্গে সৎকারের ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। এক করুণ বিয়োগান্তক পরিস্থিতি।

মোদি সরকারের এমন নিষ্ঠুর অ-সংবেদনশীল আচরণের তীব্র নিন্দা করছে আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটি। মোদি-শাহ চক্রের অপশাসনকে ধিক্কার জানাচ্ছে। ২০২০ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত মোদি সরকার দেশে একটিও হাসপাতাল নির্মাণ করেনি। অর্থাভাবের কথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। আমরা গভীর উৎকণ্ঠা এবং ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করছি যে জনস্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন একটি সরকার ২০০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজধানীকে আরও সুসজ্জিত করার বিলাসবহুল আয়োজন চলছে। রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয় করার অতি উৎসাহ প্রদর্শন করছে এই সরকার। অতিমারীর কালে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়েছে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়। ভারতের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান অনতিবিলম্বে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। এই সরকারের ক্ষমতাসীন থাকার কোনও অধিকার আর অবশিষ্ট নেই।

আপনাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

আপনাদের সাথী

কম. মনোজ ভট্টাচার্য

সাধারণ সম্পাদক

(আর এস পি)

বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে সংযুক্ত মোর্চার বিপর্যয় ও বামপন্থার সংকট

সনৎ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের পাঁচটি রাজ্যে সদ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বাংলার নির্বাচন ও তার ফলাফলের প্রতি বিশেষ নজর দেশ বিদেশের। বাংলার শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থানের তাৎপর্য এবং জমির চরিত্র কারোর অজানা নয়। সে কারণে বাংলাকে দখলে রাখার জন্য সকলে মরিয়া। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং বিজেপি'র শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাসাধিককাল ব্যাপী বিমানে প্রাত্যহিক আনাগোনা চললো বাংলায়। অতীতের অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতির মতো (যেগুলো কোনোটিই কার্যকরী হয় নি) সোনার বাংলা গড়ার কথা বলে তারা ভোটের প্রচারে অবতীর্ণ হলেন।

বিগত দশ বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেস সূচ্যগ্র জমি ছাড়তে নারাজ। তারা সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদি প্রকল্পের নামে উন্নয়নের নিশান উড়িয়ে নির্বাচনী ময়দানে নেমে পড়লেন। অপর এক প্রতিপক্ষ বাম, কংগ্রেস ও আই এস এফ (আব্বাস সিদ্দিকীর দল) সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে সকলের চাকুরির নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং কৃষকের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য আদায়ের দাবিকে সামনে রেখে ভোটযুদ্ধ নামক রাজনৈতিক সংগ্রামে হাজির হলো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী নির্বাচনী প্রচারে তথাকথিত উন্নয়নের বার্তা যেমন বঙ্গবাসীর কাছে সোচ্চারে প্রচার করলেন তার সাথে "খেলা হবে খেলা হবে" বলেও আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললেন। বিজেপি নেতৃত্ব প্রচারে এসে জনগণকে সোনার বাংলা গড়ার দিবাস্বপ্ন যেমন দেখালেন তেমনি বাংলা বিজয় তাদের হাতের মুঠোয় এরূপ বিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলেন। মোদী হয়তো ভেবেছিলেন গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের স্টাইলেই বাংলায় দখল নেবেন। কিন্তু বাংলা অন্য ভাষায় কথা বলে। বাঙালি শুধু আত্মভিমানি নয়, প্রতিবাদীও। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করে। নীরবে জবাব দেয় ভোটমেশিনে বোতাম টিপে।

বাংলার নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩টি আসনে ও বিজেপি ৭৭টি এবং অন্যরা মাত্র (যার একটি আই এস এফ চেয়ারম্যান নৌশাদ সিদ্দিকী) জয়ী হয়েছেন। বাম কংগ্রেসের ঝুলিতে শূন্য, যা বাংলার বিধানসভায় ১৯৪৬ এর পর বেনজির। সংযুক্ত মোর্চা ২৯২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪২টিতে জামানত ধরে রাখতে পেরেছে। অর্থাৎ, সংযুক্ত মোর্চা বিকল্প শক্তি হিসেবে বাংলায় নিজেদের প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য শাসন ক্ষমতায় বসবেন আর সাম্প্রদায়িক ও স্বেচ্ছাচারী বিজেপি বিরোধী আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই প্রধান দুই প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র এমন কিছু স্লোগান ও বক্তব্য আকাশ বাতাস মুখরিত করেছে যা এই শব্দ দ্বৈতে সকলের যন্ত্রণা ও বিরক্তির কারণ হয়েছে। তাদের কুরুচিকর মন্তব্য বাংলার সংস্কৃতিকে কালিমালিপ্ত করেছে। "খেলা হবে খেলা হবে" এই শব্দ দ্বৈতে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। খেলা তো সবাই ভালোবাসে, খেলা তো আনন্দের। শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলীরা তারা তাদের শিল্প নৈপুণ্যে বা দক্ষতার খেলায় সকলকে আনন্দ দান করেন। সঙ্গীতের ওস্তাদরা তাঁদের কণ্ঠ বা যন্ত্রে সুরের মূর্ছনায় মানুষকে মুগ্ধ করেন। কিন্তু যে খেলা মায়ের কোল খালি করে, মায়ের সিঁথির সিঁদুর মুছে দেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি সৃষ্টি করে সে খেলা নিশ্চয়ই কেউ চায় না। খেলায় এক পক্ষ জিতবে, অপর পক্ষ হারবে— এটাই স্বাভাবিক। বিজয়ী পক্ষকে কুর্নিশ জানাই।

নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয় পরাজয় আছে। বিজেতা নির্বাচনী ফলাফলে যতটা না সমীক্ষা করে বিজিতরা ফলাফলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ঢের বেশি, নির্বাচনী সংগ্রামে ত্রুটি কি ছিল ইত্যাদি নিয়ে। এক পক্ষের ব্যর্থতা বা ত্রুটি অপর পক্ষের সাফল্যের কারণ হয়।

(১) তৃণমূল কংগ্রেসের খেলা খেলা বা তথাকথিত উন্নয়নই সাফল্যের শীর্ষে আরোহণের একমাত্র কারণ নয়। এই ভোটে মানুষের রায় আড়াআড়ি বাবে দু ভাগ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র মধ্যে। বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক ও ভাষাভিত্তিক রাজনীতির আগ্রাসন থামাতে পারেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন বাংলার ভোটাররা। দুর্নীতি, কর্মসংস্থান, আইনশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষকের ফসলের সঠিক দাম ইত্যাদি ইস্যু ভোটের সময় উঠে এলেও শান্তিতে বসবাস ও ধর্মীয় সহাবস্থানের পরিবেশকেই আগলে রাখতে চেয়েছে তারা। তাদের অধিকাংশের ধারণা, একমাত্র মমতাই এই পরিবেশ দিতে পারেন। (২) সংযুক্ত মোর্চার আব্বাসের দলকে ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়ক দেওয়া হলেও আমজনতার বড় অংশের কাছে তারা সাম্প্রদায়িক শক্তিই। উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় আব্বাসের সঙ্গে জোট বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। আব্বাসের সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছে ঠিকই, যেমন ব্রিগেডের সভায় আশাতীত জনসমুদ্র তৈরী হলো কিন্তু ভোটের বাক্সে কী তার বিরাট প্রভাব পড়লো? সভায় প্রচুর জনসমাগম হলেই প্রমাণ করে না যে, ভোটে জেতা যাবে। (৩) সংখ্যালঘুর অধিকাংশ ভোটই পড়েছে তৃণমূলের বাক্সে। (৪) আদর্শগতভাবে বিপরীত মেরুতে যাদের অবস্থান তাদের সাথে জোট করে ধর্মীয় মেরুকরণের বিরোধিতা করতে গিয়ে বামেরা নিজেরাই ওই মেরুকরণের শিকার হয়েছেন। (৫) গত দশক বছর শাসন ক্ষমতায় থাকার কারণে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রবণতা জমা হয়েছিল, বামেরা ভোটে সেই ফয়দা তুলতে পারে নি, সেখানে ফয়দা তুলেছে বিজেপি। (৬) কর্পোরেট মিডিয়া হাউসগুলো ২০১৪ সাল থেকে এবং আরো নির্দিষ্টভাবে ২০১৯ থেকে বাংলায় দুই মেরু রাজনীতির প্রচার ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছিল। বাংলার মানুষের কাছে বেছে নেবার জন্য, মিডিয়া দুটি বিকল্পই তুলে ধরেছিল—তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। সেক্ষেত্রে সংযুক্ত মোর্চার দলগুলো যতই সঠিক দাবি নিয়ে সোচ্চার হোক না কেন অধিকাংশ মানুষ তাকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। (৭) ২০১৬, ২০১৯-এর নির্বাচনে অনেক বাম ভোট রাম-এ গিয়েছিল। এবার স্বৈরতন্ত্রী বিজেপিকে আটকাতে সম্ভবত বহু বাম ভোট তৃণমূলে গিয়েছে। (৮) সিভিল সোসাইটির একাংশ (যেখানে বেশ কিছু বাম সমর্থক) বার বার প্রচার করেছে নো ভোট টু বিজেপি। তারা কিন্তু ভোটটা সরাসরি বামেদের দিতে বলেনি। (৯) বাম নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের নাড়ির গতি না বুঝে ওপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ায় তাদের দূরদর্শিতার অভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। (১০) কংগ্রেস নেতৃত্বের আত্মম্ভরিতা নির্বাচনী পরাজয়ের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (১১) ২০১৬ ও ২০২১ এ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলো বামেদের। ২০২১-এ বামেদের জেতা সিট ছেড়ে দেওয়া হলো। অথচ ২০১৮ এবং ২০১৯-এ জোট হয় নি, জেতা সিট ছাড়া যাবে না বলে। অর্থাৎ বাম নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের কোনো ধারাবাহিকতা বা স্পষ্টতা নেই।

নিজেদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভুলে গিয়ে বা উপেক্ষা করে নির্বাচনী সংগ্রামে শ্রেণির বিচার না করে জোট করলে যা হবার তাই হয়েছে। সাধারণ মানুষ বামেদের এই জোটকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এখনও সময় আছে, নিজেদের ভুলত্রুটি অকপটে স্বীকার করে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বস্তুনিষ্ঠ আত্মসমালোচনার মাধ্যমে পার্টির ভাবনায় তারুণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে তুলুন। বাম ছাড়া অন্য কোনো জোট নয়। এ কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন পৃথিবীর দেশে দেশে দক্ষিণপন্থীরা নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বামপন্থার নিধনের যজ্ঞে মেতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন ধনিক দেশগুলো কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নবাদকে মদত দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে মোদী সরকার আর এস এস দ্বারা পরিচালিত, তাদের চরম শত্রু কমিউনিস্ট বা বামপন্থীরা। বামপন্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সৎ, নিষ্ঠাবান, অভিজ্ঞ, রাজনীতি সচেতন কমরেডদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে বয়স্করা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে পরামর্শ দান করুন। কথায় আছে, চরম অন্ধকারতম মেঘের মধ্যেও দেখা যায় রূপালী রেখা। শূন্য থেকেই শুরু হোক যাত্রা। নূতন প্রাণবন্ত কমরেডরা হাজির।

(মতামত লেখকের)

বামফ্রন্টের সমস্ত শরিকদল ও জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়কদের প্রতি

প্রিয় কমরেড,

গত ৬ই মে ২০১২ সকাল ১১টায় রাজ্য বামফ্রন্টের সভা অনুষ্ঠিত হয়। শোকপ্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভার শুরুতে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল বিধানসভা এলাকায় ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীসহ তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাতক বাহিনীর নেতৃত্বে গাড়ি চাপা দিয়ে সি পি আই (এম) কর্মী কাদের মন্ডলকে খুন করা হয়। নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনই পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনীর হাতে নিজ বাড়িতেই খুন হয়েছেন কমরেড কাকলী ক্ষেত্রপাল এবং উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায় আই এস এফ কর্মী হাসানুজ্জামান। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর পরই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও খুন হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ কম. জয়ন্ত রায়, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক নেত্রী, প্রাক্তন শান্তি চ্যাটার্জী, প্রয়াত শঙ্খ ঘোষের পত্নী লেখিকা প্রতিমা ঘোষের জীবনাবসানে এবং এই সময়কালে যাঁরা কোভিড সংক্রমণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তাঁদের সকলের স্মরণে শোকজ্ঞাপন করা হয়।

সভায় কেরালার এল ডি এফ-এর বিপুল জয় এবং তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে উভয় রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানানো হয়।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে বামফ্রন্টের সভায় প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় উল্লেখ করা হয় রাজ্যে সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী ও সহযোগীদের বিপর্যয়কর নির্বাচনী ফল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে। রাজ্যের জনগণের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিজেপি পরাস্ত হয়েছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস লাভবান হয়েছে। স্থির হয়েছে বামফ্রন্টের সব শরিকদল নিজ নিজ পার্টিতে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রাথমিক পর্যালোচনার পর পুনরায় রাজ্য বামফ্রন্টের সভায় নির্বাচনী পর্যালোচনা হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠা লাভ করে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে বামপন্থী ও সংযুক্ত মোর্চার শরিকদলের ওপরে বিভিন্ন জেলায় হামলা আক্রমণ সংগঠিত করেছে। বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ভাঙচুর লুটপাট, পার্টিকর্মীসহ সাধারণ সমর্থকদেরও ওপরও দৈহিক আক্রমণ, পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং এমনকি কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনাও ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে সব জেলায় বামফ্রন্টের উদ্যোগে ক্ষেত্র বিশেষে সংযুক্ত মোর্চার প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন সমীপে অবিলম্বে এই বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য ডেপুটেশন দিয়ে দাবিপত্র পেশ করার কর্মসূচি নিতে হবে। ইতিমধ্যে ৬ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বাম ও সংযুক্ত মোর্চার প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলাশাসকের কাছে তথ্য সম্বলিত বক্তব্যসহ দাবিপত্র পেশ করা হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বামফ্রন্টের সব শরিকদলের জেলায় জেলায় বিভিন্ন পার্টি অফিস রয়েছে তা, খোলা রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নিয়ম করে অফিসে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের উপস্থিত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে নির্বাচনে বিপর্যয়কর ফলের কারণে বিভিন্ন দলের পার্টি সদস্য, কর্মী ও অনুরাগীদের মধ্যে হতাশার পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এই হতাশা কাটানোর জন্য সব দলের সদস্যদেরই ঐক্যবদ্ধভাবে সচেতন প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে।

এই সময়ে কোভিড সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ-এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিদিনই রেকর্ড সংখ্যক মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন। বহু মানুষ চিকিৎসার সুযোগ সেভাবে পাচ্ছেন না এবং মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন। চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া মানুষের মধ্যেও মৃত্যুর হার ক্রমবর্ধমান। এমতাবস্থায় আমাদের বিভিন্ন দলের কর্মীবাহিনী বিশেষ করে, ছাত্র-যুব-মহিলাদের উদ্যোগ নিয়ে মাস্ক পরা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা সানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে এলাকায় এলাকায় যুক্ত থাকতে হবে। করোনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের সময় যেভাবে মানুষের কাছে সচেতনতার প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজকর্ম এবং দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করা ও কম পয়সায় খাদ্য সরবরাহের জন্য কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সম্ভবপর ক্ষেত্রে এবারও তা চালু করতে উদ্যোগী হতে হবে।

লক্ষ্যণীয়, দু-একটি জেলায় ইতিমধ্যে জেলা বামফ্রন্টের সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত জেলাতেই বামফ্রন্টের সভা অনুষ্ঠিত করে জেলার অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে এবং নির্বাচনী প্রাথমিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আশা করি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অভিনন্দন সহ,

(বিমান বসু)

সভাপতি

Vol. 68 Issue No. 35 শনিবার ১ মে '২১, ৮ মে ২০২১ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে সন্ত্রাস বন্ধের আর্জি জানালেন আর এস পি রাজ্য সম্পাদক

৫ মে, ২০২১

মহাশয়া,

প্রথমেই তৃতীয়বার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আপনাকে ও আপনার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের সকলকেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

আপনার দলের সমর্থকদের পক্ষ থেকে কয়েকটি জায়গায় নির্বাচন পরবর্তী যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের দলের ও বামপন্থী কর্মীগণ এখন যে ভয়াবহতার সম্মুখীন হয়েছেন তা আপনার জ্ঞাতার্থে আনার লক্ষ্যেই এই পত্র প্রেরণ করছি।

মহশয়া, নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি যে খবর আমার কাছে এসেছে তাতে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, রাজ্যের বেশ কিছু ব্লকে আমাদের দলের কর্মী ও সমর্থকদের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের কতিপয় কর্মীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলার দুটি এলাকায় আমাদের দলীয় দপ্তর দখল ও ভাঙ্গা হয়। হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত রামমোহন ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোবিলম্বা, গোবিন্দপুর গ্রামের চারজন কর্মীর বাড়িতে হুমকি ও ভাঙ্গচুর চালানোর ফলে তারা বাধ্য হয়ে এলাকা ত্যাগ করে গা ঢাকা দিয়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করছেন। একই অবস্থা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ন্যাজাট থানার অন্তর্গত বয়েরমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িহাটি গ্রামের ১০টি বুথের দলীয় কর্মীদের। মিনাখাঁ থানার বিপরীতে অবস্থিত কয়েকটি দোকানের মালিক, জেলার এক আর এস পি নেতার আত্মীয় হওয়ার অপরাধে তাদের দোকান জোরপূর্বক বন্ধের ও পুলিশকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই জেলার সন্দেশখালি ১ ও ২ ব্লকে বসবাসকারী জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের বাড়ি আক্রমণ ও হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। এমনকি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমাদের দলের কর্মীদের অনেকেরই রেশন পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দলের নেতা ও বাসন্তী বিধানসভায় প্রার্থী সুভাষ নস্করের চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের আদি বাড়িটি আক্রমণ করা হয়, টিউবওয়েল ভেঙে দেওয়া হয়, জীবনতলা থানার অন্তর্গত আঠারবাঁকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বহু বাড়ি আক্রমণ করা হয়, জেসিবি দিয়ে বাড়ি ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে, বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। বাসন্তী বিধানসভার বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গচুর সংগঠিত করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন জনগণের রায়ে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার গঠনের পূর্বেই দলনেত্রী হিসেবে দলের কর্মীদের সংযত আচরণের যে নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন তা, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাজ্যজুড়ে আমাদের দলসহ সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর যে আক্রমণ করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে না পারলে রাজ্যজুড়ে এই অনভিপ্রেত হিংসা পাল্টা হিংসার সংস্কৃতি থেকে রাজ্যকে কি আদৌ মুক্ত করা সম্ভব হবে? এই রাজনৈতিক হানাহানি অবিলম্বে কঠোর হাতে দমন করতে না পারলে রাজ্যবাসীকে করোনার ব্যাপক সংক্রমণের হাত থেকে মুক্ত করা কি দুরূহ হয়ে পড়বে না?

আপনি রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব। রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় আপনার উপরেই ন্যস্ত। আপনার কাছে তাই আবেদন জানাই, দলনেত্রী হিসেবে দলের কর্মীদের এহেন হিংসাশ্রয়ী আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিন ও সকল থানার পুলিশ প্রশাসনকে রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসার বাতাবরণকে কঠোর হাতে নিরপেক্ষতার সাথে দমন করার যথাযথ নির্দেশ দিন।

ধন্যবাদান্তে,
বিশ্বনাথ চৌধুরী
সম্পাদক
আর এস পি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

রাজ্যব্যাপী সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে সংযুক্ত মোর্চার দাবি

SM/11/2021 এ

ফোন নং (০৩৩) ২২১৭ ৬৬৩৩/ ৪০০৭ ৪৫১২

মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয় : নির্বাচনী ফলপ্রকাশ পরবর্তী হিংসা বন্ধ করতে হবে

তারিখ : ৮ই মে, ২০২১

মহাশয়া,

শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মানুষের রায়ে তৃতীয় বার তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসীন হলেও রাজ্যজুড়ে যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটছে তা উদ্বেগজনক এবং নিম্নরূপ :

১) বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যব্যাপী বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে লাগামহীন সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সশস্ত্র দুষ্কৃতী বাহিনী। বেশ কিছু জায়গায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাও একইরকমভাবে সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করছে।

২) কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ জেলার সর্বত্র খুন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি, বোমা নিক্ষেপ, লুঠ, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে চলেছে, কোথাও প্রশাসন নীরব দর্শক কোথাও আক্রমণকারীদের মদতদাতা।

৩) রাজ্যজুড়ে অবাধ লুঠতরাজ চলছে, যা ডাকাতিকেও হার মানিয়ে দেয়। ভাঙড় ও ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় কয়েকশত বাড়ির সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েক হাজার দোকানের সর্বস্ব লুঠ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ট্র্যাক, ছোট গাড়ি, মোটর ভ্যান নিয়ে আসা হচ্ছে লুঠের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোথাও কোথাও জেসিবি মেশিন ব্যবহার করে বাড়ি, দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধানের গোলা, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের শাসসবজি অবাধে লুঠ করছে এই দুষ্কৃতীরা। এইভাবে লুঠ নৃশংস ডাকাতদলও করে না। এই নির্বাচনের প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, প্রাক্তন বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বাড়ি এবং সম্পত্তির লুঠ ও ভাঙচুর চলছে। এই বল্গাহীন সন্ত্রাসের ফলে রাজ্যের কয়েক হাজার মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে এক কাপড়ে গৃহহীন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোলা আকাশের নীচে দিনযাপন করছে।

৪) এর সাথে চলছে নৃশংস শারীরিক আক্রমণ। রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বয়স্ক, গর্ভবতী মহিলা, শিশু কেউ রেহাই পাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই রাজ্যের নির্বাচনী ফল প্রকাশের পরবর্তী হিংসায় কাকলি ক্ষেত্রপাল (জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান), হাসানুরজ্জামান (দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা) সহ ১৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে, এর মধ্যে ১ জন মহিলা এবং ১ জন ১৪ বছরের কিশোর রয়েছে।

৫) এর সাথে চলছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস ভাঙচুর ও দখল করা।

৬) বিভিন্ন জায়গায় পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্পত্তি লুট করার জন্য। বারুদের স্তূপের ওপর রাজ্যের বিভিন্ন জেলাকে দাঁড় করাতে চাইছে শাসক দল, ধর্মীয় মেরুকরণ করার জন্য। এর থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠনগুলি। সব কিছুই ঘটছে প্রশাসনের চোখের সামনে।

এক কথায় শাসক দলের মদতপুষ্ট সশস্ত্র দুষ্কৃতী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে রাজ্যের বেশীরভাগ এলাকা। লুঠ, আক্রমণ, বাড়ি-দোকান ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের শত শত ঘটনা ঘটলেও একজন দুষ্কৃতীকেও গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ প্রশাসন।

উপরের প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে প্রশাসনের নানা স্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

আমাদের দাবি :

১) অবিলম্বে সব রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২) সব লুঠেরা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) লুঠ হয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে তা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) সব ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। সব ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা ও উপযুক্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে। যাদের বাড়ি ভাঙা হয়েছে তাদের বাড়ি পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৫) রাজ্যের সব বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে।

৬) দখল হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক দলের কার্যালয়গুলি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রশাসনকে তৎপরতার সঙ্গে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

আশা করি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনারা দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন যাতে রাজ্যের মানুষ গণতান্ত্রিক পরিবেশে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-